স্বর্গ হইতে বিদায়

ভবানী মুখোপাধ্যায়

কমলা পাব্লিশিং হাউস
৮।১এ, হরি পাল লেন
কলিকাতা।

—গ্রন্থস্বত্ব গ্রন্থকারের—

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৫৫ চৈত্র
মূল্য—দুই টাকা আট আনা

শ্রীসত্যচরণ দাস কর্ত্তৃক ৯।এ, হরি পাল লেনস্থ আলেক্‌জান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ৮।১এ, হরি পাল লেন হইতে প্রকাশিত

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বন্ধুবরেষু—

শ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায়

'নন্দন-পুরী' ছাড়িবার কয়েক দিন আগে নন্দরাণী ও কুঞ্জর বিবাহ হইয়া গেল। ইহার কয়েক দিন পরেই কুঞ্জবিহারী নসীবপুরে আর সিঁথিতে সিন্দুর লেপিয়া নন্দরাণী দেবগ্রামে চলিয়া গেল।

দু'বছরের মধ্যে কুঞ্জবিহারীর সহিত নন্দরাণীর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে যথারীতি পত্র-বিনিময় হইয়াছে, নন্দরাণী সেগুলি আজো সযত্নে ও সগৌরবে রক্ষা করিতেছে। একটি চিঠিতে কুঞ্জ লিখিল, চিরকালের বাসনানুযায়ী সে এতদিনে "সোফার" হইয়াছে। রাজা বাহাদুরের বিশাল মোটরখানি এখন সে অবলীলাক্রমে চালাইতে পারে।

কিন্তু এই সোফারগিরিই তাহাদের কাল হইল। মাধবী একদিন হঠাৎ নন্দরাণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তাড়াতাড়ি একটু সংযত ও পরিচ্ছন্ন বেশবাসে নন্দরাণী মাধবীর কাছে দৌড়িল।

মাধবী রাগে অগ্নিবর্ণ হইয়া আছেন। ব্যাপার যে একটু জটি[illegible] বুঝিতে নন্দরাণীর দেরী হইল না।

নন্দরাণী কহিল—আমায় ডেকেছেন মা ?

একখানি চিঠি দেখাইয়া মাধবী কহিলেন—কি হয়েছে জানো ? ছি ছি কি কেলেঙ্কারী, জানো কুঞ্জ কি করেছে ? আর একটু হলে নসীবপুরের রাণী প্রায় মারা যেতেন, খুব বেঁচে গেছেন, যত সব মাতাল, বদমায়েস। আমি বরাবরই জানি কুঞ্জ একটা কাণ্ড বাধাবে—

বিবর্ণ মুখে শুষ্ক কণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—এখন কেমন আছেন মা তিনি ?

সে কথার উত্তর না দিয়া মাধবী সরোষে কহিলেন—তোমার এ বিষয়ে কিছু বল্‌বার আছে ?

নন্দরাণী ভয়ে ভয়ে কহিল—কি জানি মা, কেন যে এ রকম হ'ল, তা ত' জানি না। তবে ওঁর এ রকম—

—কি ! আমরা মিথ্যাবাদী নাকি ? আমাদের কথায় তোমার বিশ্বাস হয় না ?

—না মা, আমি সে কথা বলিনি !

—নিশ্চয়ই বলেছ, এখনই তোমার বাক্স পেঁটরা গুছিয়ে নাও, আমাদের আর তোমাকে দরকার নেই, এ রকম লোক রাখা চলে না—

মাধবীর স্বামী সংবাদপত্রের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, এতক্ষণে শুধু কহিলেন—কিন্তু মাধবী !—

কিন্তু মাধবী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কি দাঁড়িয়ে রইলে যে, যাও !

কুঞ্জ ও নন্দরাণীর জীবননাট্যের ইহাই পট-ভূমিকা।

২

পূজার বাজার করিতে কুঞ্জ শহরে গিয়াছিল। অতীতের স্মৃতি লইয়া আন্দোলন করা তাহার স্বভাব নয়, সুতরাং নন্দরাণীর মতো সেও যে সহসা চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছে এ কথা বলা চলে না। যে-অতীত তাহাদের প্রতি সুবিচার করে নাই, তাহাকে মিছামিছি স্মরণ করিয়া আর লাভ কি। কিন্তু জীবনের সহিত যাহার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ তাহাকে ভোলা কি সহজ !

নসীবপুরের দুর্ঘটনা সত্যই আকস্মিক, তাহার জন্য কুঞ্জকে অপরাধী করা চলে না। সুরা-সংস্পর্শে সে মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠিত বটে, কিন্তু সে দিন সে সহজ অবস্থাতেই ছিল।

রাণীমার সরিষাপোতা বালিকা বিদ্যালয় উদ্বোধন করিতেই সন্ধ্যা

হইয়া গেল, দুর্গম পথ, একটি হেড্‌লাইট আবার খারাপ, অতএব সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লীপথে গাড়ী যদি খানায় পড়িয়া যায় তাহা হইলে সে অপরাধ কাহার এ কথা কে বলিবে!

তাহাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্ঘটনার ইহাই সূচনা—তারপর যে কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা ভাবিলে নন্দরাণী আজো শিহরিয়া ওঠে! পরিচিত অপরিচিত কত জায়গায় দুঃখ দুর্দ্দশার কথা জানাইয়া আবেদন পাঠাইয়াছে, ধনীর দুয়ারে গ্লানিকর প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কাটিয়াছে কিন্তু সব ব্যর্থ হইয়াছে, কুঞ্জর কলঙ্ককাহিনী সর্ব্বত্রই অতিরঞ্জিত আকারে পৌছিয়াছে। অমন দায়িত্বহীন সোফারকে চাকরী দেওয়া আর মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করিয়া আনা একই কথা।

নন্দনপুর ও দেবগ্রামে নন্দরাণীর কত লোকের সহিতই না পরিচয় ছিল, পৃথিবী ছিল প্রশস্ত। সেই পৃথিবীর পরিধি যেন সহসা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

রাজা বাহাদুর সকল কর্ম্মচারীর কথা ম্যানেজার সাহেবকে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। যথাযোগ্য সাহায্য করিবারও একটা ব্যবস্থা হইয়াছিল। অবশেষ নন্দনপুর এষ্টেটের ম্যানেজার সাহেবের কাছে আবেদন পাঠান হইল।

প্রতীক্ষায় কত দিন কাটিয়া গেল কিন্তু আবেদনের উত্তর মিলিল না।

অথচ এই দুঃসহ দুর্দ্দশার মধ্যে মাথা তুলিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু আশ্চর্য্য দৃঢ়তা নন্দরাণীর, সেই যেন পুরুষ, সে জানে তাহাদের বাঁচিতেই হইবে, তাই নিদারুণ হতাশার মধ্যেও সে বিশ্বাস হারায় নাই।

আপনাকে বাঁচাইয়া রাখাই ত' আর যথেষ্ট নয়, স্বামীকে তাই নন্দরাণী এই বিপদের এতটুকু অংশ গ্রহণ করিতে দেয় না।

কুঞ্জ সবই বোঝে, কিন্তু যে নিরুপায়, চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন তাহার আর কি করিবার আছে!

কলহ নয়, কথার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়াই কুঞ্জ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বাহিরে তখনও সামান্য আলো ছিল বটে, ঘরে কিন্তু বেশ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। নন্দরাণী দাওয়ায় বসিয়া তৈলহীন হ্যারিকেনে আলো জ্বালিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় বাহিরে কুঞ্জর নাম ধরিয়া অপরিচিত কণ্ঠে কে যেন ডাকিল। দুঃখের দুর্ভাবনায় আচ্ছন্ন কুঞ্জর কাণে এ ডাক পৌছিল না। নন্দরাণী কিন্তু স্পষ্টই শুনিয়াছিল, সে সচকিত হইয়া কহিল—কিগো ঘুমিয়ে পড়্লে নাকি এরি মধ্যে? কারা যে ডাক্ছে তোমাকে!

কুঞ্জ এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল নাকি, সবিস্ময়ে কহিল, আমাকে আবার ডাক্বে কে! মিছামিছি চেঁচিও না।

শান্তকণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—সাড়া দাও না, বল্ছি কারা ডাক্ছে।

কতকটা অনিচ্ছার সহিতই কুঞ্জ উঠানে নামিল, নন্দরাণীরও কৌতূহল কম নয়, উৎকণ্ঠ আগ্রহে সেও দরজার পাশে গিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

—তোমার নামই কি কুঞ্জবিহারী নাকি?

কুঞ্জ সবিনয়ে মাথা নাড়িয়া সেই যে কুঞ্জবিহারী তাহা স্বীকার করিল। তারপর কতকটা ভয়ে ভয়েই বলিল—কিন্তু আপনি—?

এত দুঃখের মধ্যেও যাই হোক কুঞ্জর সম্ভ্রমসূচক ভঙ্গী দেখিয়া নন্দরাণী কতকটা আশ্বস্ত হইল।

ভদ্রলোকটি গলার স্বর অপেক্ষাকৃত নামাইয়া কহিলেন—আমার কথা বল্ছি, তোমাদের কাছে বিশেষ একটু কথা আছে, কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে ত' আর সব কথা বলা সম্ভব নয়, ভেতরে হলেই বোধ হয় ভালো হ'ত।

কুঞ্জ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—বেশ ত' সেই ভালো, আসুন ভিতরে গিয়েই কথা হবে'খন।

নন্দরাণীর শরীরে আনন্দ-তরঙ্গ বহিয়া গেল, কুঞ্জর উঠানে যেন সেই সন্ধ্যায় সহসা ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছে, জ্যোতির্ম্ময় দেহভঙ্গিমায় প্রসন্ন বরাভয় পরিস্ফুট।

উঠানে ঢুকিতেই নন্দরাণী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে কহিলেন—নন্দরাণী ?

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, কুঞ্জ বিস্ময় দমন করিয়া কহিল, আসুন এ পাশটায় বসা যাক্।

—নিশ্চয়ই, অনেক কথা, না বস্‌লে হবে কেন !

নন্দরাণী সযত্নে মাটির দাওয়ায় একখানি আসন বিছাইয়া দিল। কুঞ্জ বা নন্দরাণী আগে কখনও ভদ্রলোকটিকে দেখে নাই, তাহারা সসম্ভ্রমে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোকটি বোধ হয় ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কাহার সহিত আলাপ সুরু করা যায়। অবশেষে বোধ করি কতকটা ঠিকই সিদ্ধান্ত করিয়া নন্দরাণীর সহিত আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কাজে কাজেই মাঝে মাঝে কুঞ্জর দিকে আংশিক দৃষ্টিপাত করিয়া নন্দরাণীকে বলিতে লাগিলেন—

—তোমরা দু'জনেই আমাকে দেখে একটু অবাক হয়েছ না, তা অবাক হবারই ত' কথা, আমাকে ত' আর তোমরা চেন না, আমার নাম জগদীশ চৌধুরী, নন্দনপুর এষ্টেটের নতুন ম্যানেজার। নন্দরাণী, তুমি আর কুঞ্জ বাবাজী আমাকে যে চিঠি দিয়েছিলে তা আমি পেয়েছি, সেই জন্যই ছুটে এলুম মা। কাছাকাছি একটা কাজ ছিল, তাই ভাবলুম এই ত' এখানেই, যাই কুঞ্জ বাবাজীদের সঙ্গে নিজেই একবার দেখা করে আসি। আহা তোমরাও বসো না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

জগদীশবাবুর মহানুভবতায় স্বামী-স্ত্রী সমভাবেই মুগ্ধ হইয়াছে। কুঞ্জ

বলিল—আপনার সঙ্গে সমান ভাবে বস্‌বার যুগ্যি লোক নাকি আমরা, কি যে বলেন—!

জগদীশবাবু সে কথার উত্তর না দিয়া কহিলেন—বড়ই কষ্টে পড়েছ' দেখ্‌ছি, সত্যি বাপু শুনে অবধি মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। জানোই ত' রাজা বাহাদুরের কড়া হুকুম কর্ম্মচারীদের কষ্ট যেন না হয়, তোমরাও স্বামী-স্ত্রীতে আবার কাজ কর্‌তেই চাও,—এ ত' ভালো কথা, মানে তোমাদের মতো লোক যদি কাজকর্ম্ম না পায় ত' কি যতো সব—

ইহার পর আত্ম-সম্বরণ করা কঠিন, নন্দরাণী কতকটা আত্মহারা হইয়া বলিয়া ফেলিল—আপনি দেবতা, আমাদের আপনি বাঁচান।

—আমার ক্ষমতা কতটুকু—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই জগদীশবাবু একটু হাসিলেন, অনেকগুলি কথা একসঙ্গে বলিয়া যেন হাঁপাইয়া গিয়াছেন, স্ফীত দেহে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, তারপর বলিলেন—দেখ বাপু, সব কথা খোলাখুলি হওয়াই ভালো, গোড়াতেই বলে রাখি: চাকরী করে দিতে আমি পার্‌বো না, মানে আমার ক্ষমতায় নেই।

এই কথা ক'টি বলিয়াই জগদীশবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নন্দরাণী ও কুঞ্জ-বিহারীর উপর তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এক মুহূর্ত্তেই নন্দরাণীর উৎসাহ-উত্তেজিত মুখখানি বিবর্ণ ও পাংশু হইয়া গেল। সে ম্লান মুখে কুঞ্জর মুখের দিকে চাহিল। আশার আলোক দেখিবার সম্ভাবনায় কুঞ্জর দুঃখক্লিষ্ট মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এই কথা শুনিয়া সে বিশেষ বিরক্তি ও হতাশাভরে কহিল—দেখুন যত দোষ নন্দ ঘোষ, আমার কোনো অপরাধ নেই, গাড়িতে আলো নেই, খারাপ রাস্তা, গাড়ি যদি—

নন্দরাণীও অনুনয়ের ভঙ্গীতে কহিল—আপনিই একটু বিবেচনা করুন—

যথাসম্ভব দৃঢ়তার সহিত জগদীশবাবু বলিলেন—তা আর হয় না কুঞ্জ, আমি কিছুই করতে পারি না।

ইহার পর আলাপ-আলোচনা আর চলা সম্ভব নয়। কুঞ্জ ভাবিতে লাগিল ইহার নাম কি বিশেষ দরকারি কথা, আর দুঃখ ও অভিমানে নন্দরাণীর চোখ দু'টি জলে ভাসিয়া গেল। কিন্তু জগদীশবাবুর উঠিবার যেন এতটুকু তাড়া নাই, তিনি বেশ প্রশান্ত ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর কহিলেন—তোমাদের বিয়ে হয়েছে বোধ হয় বছর তিনেক হবে, না নন্দরাণী—

নন্দরাণী শিহরিয়া উঠিল, এ আবার কি প্রশ্ন, তবু ভয়ে ভয়ে কহিল—না প্রায় আড়াই বছর হবে।

—ছেলেপুলে নেই?

—না।

—কিন্তু, ছেলেপুলে খুব ভালোবাসো না, মানে একটি ছেলে থাকলে বেশ হ'ত, নয়?

নন্দরাণী অন্যরকম বুঝিয়া কহিল—আগে নন্দনপুরে ত' রাণীমার ছেলেরা আমার কাছেই থাকত', দেবগ্রামেও দিদিমণির—

—হুঁ, সে কথা ত' জানি, তা নয়। একটি ছেলে মানুষ করতে পারবে? মানে তোমাদের কাছেই থাকবে!

—ছে লে মা নু ষ! সে কি করে হবে? আমাদের—

—আহা, সেই কথাই ত' বলছি, একুশ দিনের একটি খোকা, চমৎকার খোকা—যেন রাজপুত্তুর। কি গায়ের রঙ, মাথায় এখনই একমাথা চুল, সেই ছেলেটিকে যাতে কেউ মানুষ করে আমাকে তার বন্দোবস্ত করতে হবে, মানে আমিই ভার নিয়েছি আর কি! একটা ভালো জানাশোনা জায়গা না হলে ত' আর যেখানে সেখানে যার তার

হাতে তাকে ছেড়ে দেওয়া চলে না। কি বলো গো কুঞ্জ, তাই মনে হলো তোমাদের কথা—

—খোকার মা? নন্দরাণী প্রশ্ন করিল।

—আহা! তিন দিন না কাটতেই ছেলে মা খেয়েছে, তা নইলে— আবার ক্ষণিক স্তব্ধতা, অবশেষে কুঞ্জ কতকটা সন্দেহভরেই প্রশ্ন করিল—

—কিন্তু ছেলের বাবা?

—সে এখন কিছুই বল্‌তে পার্‌বো না। গলার স্বরে যথেষ্ট কোমলতা ঢালিয়া জগদীশবাবু কহিলেন—এখন বলা চলে না, তবে এ কথা বলে দিই যে, রাজা বাহাদুরের সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্কই নেই। স্পষ্ট করেই বলি বাপু, তোমাদের কাছে আর লুকোচুরি কেন, এ ছেলে ঠিক সামাজিক নয়। মানে বড় ঘরের ব্যাপার, বুঝচোই ত'—

এই কথার পর দীর্ঘকাল চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

জগদীশবাবুই স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া আবার সুরু করিলেন—মানে এ ঠিক তোমাদেরই ছেলে হবে আর কি, তোমাদের কাছে তোমাদের মতই মানুষ হবে, তবে লেখাপড়া শেখাবার একটা বন্দোবস্ত হবে। তারপর যদি তাকে সত্যি কথা বলতেই চাও, মানে তোমাদের বিবেচনায় যদি মনে করো বলা উচিত, তা সে একুশ বছরের আগে বল্‌তে পার্‌বে না। ছেলে তোমাদের, যে-ভাবে তাকে গড়বে, ঠিক সেই ভাবেই সে গড়ে উঠবে, তবে চেষ্টা কর্‌তে হবে যাতে মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠে।

—তা যেন হোল, কিন্তু ছেলেটির বাবা কি বড়লোক? এ প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে নন্দরাণী অনেক ইতস্ততঃ করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে সাহসভরে প্রশ্ন করিয়া বসিল। গরীবের ঘরের গ্রাম্য শিশু ও ধনীর দুলালের প্রভেদ নন্দরাণী ভালো করিয়াই জানে। নন্দরাণী রমণী, আর সকলের মতো তাহারও অন্তরে মাতৃত্বের গোপন কামনা সুপ্ত

রহিয়াছে। একদা তাহার কোল আলো করিয়া সন্তানের আর্বিভাব হইতে পারে, তাহা সে জানে, তাহা অপ্রত্যাশিত নহে, কিন্তু নন্দন-পুরী প্রাসাদে যে রাজকুমার খেলিয়া বেড়ায়, তাহার আদর্শে আপন সন্তানকে সে কোনো দিন আঁকিতে পারে নাই।

জগদীশবাবু বিশেষ সম্ভ্রম সহকারে প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত দুর্নীতিমূলক পরিবেশ যথাসম্ভব চাপিয়া কহিলেন, বড়লোক? শুধু বড়লোক, মানে দেশের মাথার মণি, অমন লোক এ দেশে ক'টা আছে?

নন্দরাণী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ লজ্জা অনুভব করিয়া মাটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আবার সুদীর্ঘ নীরবতা।

নন্দরাণীর মনে দ্রুত তালে সহস্র প্রশ্ন সহস্র চিন্তার উদয় হইল। ব্যাপারটি বড় লঘু নয়। বিশেষ সাবধানে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু ভাবিবার সময় লইয়া সুযোগ হারাইবার ক্ষমতা কি তাহাদের আছে? কুঞ্জ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। নন্দরাণী সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। এই গ্লানিকর জীবন যাপনের মধ্যে শিশুর আবির্ভাব তবু বৈচিত্র্য আনিতে পারিবে। ছেলে মানুষ করিতে নন্দরাণীর আর বাধা কি!

সহসা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত নন্দরাণী বলিয়া বসিল—বেশ, আপনি যা হুকুম করবেন, আমরা করবো। আপনি যখন বলছেন, তখন আর আমাদের আপত্তি কি!

জগদীশবাবুর মতো লোক এ রকম স্পষ্ট কথায় বিশেষ বিস্ময়াহত হইয়া পড়িলেন। কতকটা সন্দিগ্ধ ভঙ্গীতে বলিলেন—আমি বরং দু'চার দিন সময় দিতে চাইছিলুম, মানে বেশ মন স্থির করে তবে এ সব বিষয়ে একটা—

স্বামীর মুখের দিকে আবেদনের ভঙ্গীতে তাকাইয়া নন্দরাণী

কহিল—বেশ করে ভেবেই বল্‌ছি, উনি ছেলেপুলে বড়ো ভালবাসেন কি না!

—তাই নাকি? তা বেশ ত' বেশ ত'। কিন্তু মা, টাকাকড়ি সম্পর্কে ত' আমার কাছে কিছু জান্‌তে চাইলে না?

এইবার জগদীশবাবু প্রশান্ত ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিলেন। টাকাকড়ি ব্যাপারে এই ধরণের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে হাসাই তাঁহার বিশেষত্ব। টাকাকড়ির কথাতেই শুধু জগদীশবাবুকে হাসিতে দেখা যায়, সহসা তাঁহার ভঙ্গী পরম রমণীয় হইয়া ওঠে।

জগদীশবাবু বলিলেন—টাকাকড়ির সম্বন্ধে আমাকে ওঁরা বলেছেন যে, দশ বছর পর্য্যন্ত মাসে একশ' টাকা করে, আঠার বছর পর্য্যন্ত দুশ' টাকা, তারপর আবার অন্য বন্দোবস্ত হবে, তবে একুশ বছরের পর যে কি দেওয়া হবে না-হবে, সে কথা এখন কিছুই বলা যাবে না। আর ছেলে যদি বাঁচেই তখন টাকার জন্যে আট্‌কাবে না।

বলা বাহুল্য, যে পরিমাণ অর্থ এই বাবদ ব্যয়িত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, জগদীশবাবুর প্রস্তাব তাহার ধার দিয়াও যায় নাই, তবে তিনি যথাসম্ভব কম টাকায় রফা করিয়া কৃতিত্বের অধিকারী হইবেন, হয়ত' এ ব্যাপারে তাঁহারও অর্থকরী লাভের অঙ্ক বড় কম নয়। তাঁহার প্রস্তাব কি ভাবে গৃহীত হয় তিনি তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণে কুঞ্জ কথা কহিল। নীতির দিক দিয়া স্ত্রীর পরামর্শ সে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু অর্থ-সংক্রান্ত বিষয় তাহার নিজস্ব অধিকারে। সেই মুহূর্ত্তে একশ' টাকার কথা অতুল ঐশ্বর্য্য বলিয়াই কুঞ্জবিহারীর মনে হইল। তথাপি এ সব ব্যাপারে নানাবিধ আইন-ঘটিত বিঘ্ন জড়িত থাকে, সে কথা তাহার জানা আছে, তাই কুঞ্জ বলিল—উকীলের কাছে লেখাপড়ার টাকাকড়ি কি আমাদের দিতে হবে নাকি? একটা লেখাপড়া হবে ত'?

—লেখাপড়া হবে বৈকি! তা নইলে কি হয়, তবে সে সব আমরাই ব্যবস্থা করে দেব, তোমার কোনো খরচ-খরচা নেই। আর টাকাকড়ি ক্যাস্ সার্টিফিকেট করে দেওয়া হবে, আমার হাত দিয়েই সব পাবে, যখন যা দরকার—সুতরাং তোমাদের ভাববার কিছুই নেই। প্রথমেই ধর, এই তেজপুর ছেড়ে যেতে হবে, বাড়ী বদলের খরচা রয়েছে—

নন্দরাণী প্রায় চীৎকার করিয়াই কহিল—বা ড়ী ব দ ল ?

—বাড়ী বদল কর্‌তে হবে না? তেজপুর ছেড়ে এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে কেউ তোমাদের চেনে না, খোকাকে তারা তোমাদের খোকা বলেই স্বীকার করে নেবে, সেই ত' গোড়ার কথা।

ইহার কয়েক দিন পরে—

মকিমপুর পল্লীভবনে যবনিকা উঠিল—দোলনায় শায়িত ক্রন্দনরত শিশুকে নন্দরাণী শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কুঞ্জ বলিতেছে, চমৎকার খোকা না গো—যেন রাজপুত্তুর।

কুঞ্জর বিশেষণটির সমর্থনেই বোধকরি রাজপুত্তুর এতক্ষণে হাসিয়া উঠিল।

৩

নন্দরাণী আদর করিয়া খোকার নাম দিয়াছে জহর, সারাদিন জহরকে লইয়াই তাহার আনন্দে কাটিয়া যায়। এ আতিশয্য সময় সময় কুঞ্জর কাছে বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সাহস করিয়া সে কোনো কথা বলিতে পারে না।

নূতন জায়গায় প্রথমটা বেশ কাটিয়া গেল বটে কিন্তু চুপচাপ বাড়িতে

বসিয়াই বা কিভাবে দিন কাটে, নন্দরাণী তবু খোকাকে লইয়া আত্মহারা হইয়া আছে। ব্যবসার দিকে বরাবরই কুঞ্জর ঝোঁক ছিল, অভাব ও অভিযোগের সহিত সংগ্রাম করিয়া সেই সদিচ্ছা কোনদিন বিকশিত হইতে পারে নাই, এখন নিরবচ্ছিন্ন অবসর ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে সেই পুরাতন প্রবৃত্তি আবার প্রখর হইয়া উঠিল।

অনেক চিন্তা করিয়া, অনেকবার ইতস্ততঃ করিবার পর অবশেষে নন্দরাণীকে কুঞ্জ একদিন বলিয়া বসিল—ক'দিন ধরেই বল্‌ব-বল্‌ব মনে কর্‌ছি, ভয় হয়, তুমি আবার না ভুল বোঝ—

নন্দরাণী জহরকে ঘুম পাড়াইতেছিল, কুঞ্জর কথায় সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল—আমার ভয়েই ত' তুমি কাঁটা হয়ে আছো, আমি কি দারোগা নাকি গো? অত ভয়টা কিসের?

কুঞ্জ রহস্য করিয়া জবাব দেয়—দারোগা নয়, দারোগার বাবা। পরেই আবার সংশোধন করিয়া বলে, না না বাবা হবে কেন, তুমি দারোগার মা।

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া নন্দরাণী বলে—বালাই, দারোগা কেন, জহর অনেক ওপরে যাবে তুমি দেখো, এখন কথাটা কি বলো ত'? যে রকম ভণিতা—

অনুনয়ের ভঙ্গীতে কুঞ্জ বলে—না এমন কিছু গুরুতর কথা নয়। তোমাকে ত' সেবার বলেছিলুম, সত্যি একটা কারবার টারবার না কর্‌লে আর চলে না। পুরুষ মানুষ বসে বসে কাঁহাতক আর দিন কাটে বলো, তার চেয়ে বরং একটু খাট্‌লে যদি দু'চার পয়সা ঘরে আসে, মন্দ কি—

নন্দরাণীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, গম্ভীর হইয়া সে প্রশ্ন করিল—কিসের কারবার কর্‌বে ঠিক করেছ?

কুঞ্জ উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল—কাজ কত রকম, পয়সা ছড়ান

রয়েছে শুধু, কুড়িয়ে নেবার কায়দা জানা চাই। সে সব ঠিক করে ফেলেছি। কাছাকাছি একটা চায়ের দোকান করবো, বেশী টাকার ত' দরকার নেই, বেশী লোকও রাখতে হবে না, দু'মাসে ঘরের টাকা ঘরেই ফিরে আসবে।

কুঞ্জর উৎসাহে নন্দরাণীকে অবশেষে রাজী হইতে হয়। কুঞ্জ যখন ঝোঁক ধরিয়াছে তখন তাহাকে বাধা দেওযাটা ঠিক হইবে না।

সে শুধু বলিল—কিন্তু চায়ের দোকান ত' আর মকিমপুরে চল্‌বে না, আর এই নতুন জায়গা ছেড়ে বেশী দূরে গেলেই বা এখন চল্‌বে কেন!

অনেক কথা কাটাকাটির পর স্থির হইল উপস্থিত কুমারহাটিতেই দোকান খোলা হইবে, বেশী দূর নয়, সপ্তাহে একবার সহজেই বাড়ী আসা চলিবে।

আনন্দে ও উত্তেজনায কুঞ্জ মাতিয়া উঠিল।

এক বছরের মধ্যেই কামারহাটিতে কুঞ্জর চাযের দোকান বেশ জমিয়া উঠিল। কাছাকাছি কারখানা থাকায দোকানে দিনরাত খরিদ্দারের আর বিরাম নাই। কুঞ্জকে তিনটি লোক রাখিতে হইয়াছে। নিজে একটি বাক্স লইযা সারাদিন বসিয়া থাকে, আর পয়সা গুণিয়া তোলে।

নন্দরাণীর জহর—আর কুঞ্জর চাযের দোকান—উভয়েই নূতন নেশায উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময জগদীশবাবুর চিঠি পাইয়া কুঞ্জ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তিনি লিখিয়াছেন—

"জহরকে দেখিয়া আসিলাম, যে ভাবে সে মানুষ হইতেছে তাহা দেখিলে আনন্দ হয়, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন! জহর একা থাকে, সুতরাং নন্দরাণীর কাছে একটি ছোট্ট খুকী রাখিয়া আসিয়াছি। মেয়েটি সম্ভ্রান্ত ঘরের, আশা করি সে জহরের মতোই সমান আদর পাইবে। ইহার জন্ত যথোচিত অর্থ ব্যবস্থা করিয়াছি।"

চিঠিটি বারবার করিয়া পড়িয়া কুঞ্জ কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সত্য বলিতে কি কুঞ্জ একটু অসন্তুষ্ট হইল, তাহার বাড়ীটা কি

ক্রমশঃ অনাথ-আশ্রম হইয়া উঠিবে নাকি! নন্দরাণীর বুদ্ধির সে বরাবর প্রশংসা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখন তাহার ওপরই রাগ হইতে লাগিল, নন্দরাণী হয়ত' জগদীশবাবুর সহিত কথায় আঁটিয়া ওঠে নাই, হয়ত' বা টাকার প্রলোভনেই ভুলিয়াছে। টাকার কথা মনে হইতেই কুঞ্জর রাগ কতকটা কমিয়া গেল, কিন্তু নন্দরাণীর অতৃপ্ত মাতৃত্বের কথা সে কিছুতেই ভাবিতে পারিল না।

জহরকে এখন আর পরের ছেলে বলিয়া মনেই হয় না, তাহার সামান্য একটু সর্দিকাশির সংবাদ পাইলে কুঞ্জ ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তবু জগদীশবাবুর এই চিঠি তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

নন্দরাণীকে দু'চার কথা শোনাইয়া দিবে এমনই একটা দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কুঞ্জবিহারী সেবার বাড়ী ফিরিয়াছিল, কিন্তু নন্দরাণীর আনন্দোচ্ছল প্রবৃত্তি ও খুকীর বর্ণচ্ছটায় সে বিহ্বল হইয়া গেল। যাহার ঘরেই জন্মিয়া থাকুক এ মেয়ে যে উত্তর কালে রাজরাণী হইতে পারে, জ্যোতিষী না হইলেও কুঞ্জ তাহা অনায়াসেই বলিতে পারে। এমন সন্তান যাহারা অবলীলাক্রমে পরের হাতে সঁপিয়া দিতে পারে তাহারা কি মানুষ! বিধাতা তাহাদের হৃদয় কি ভাবে গড়িয়াছেন! স্বামী-স্ত্রীতে তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পায় না।

ইতিমধ্যেই নন্দরাণী মেয়েটির নাম দিয়াছে সুবর্ণ। সেবার কুঞ্জ যতক্ষণ মকিমপুরে ছিল, সুবর্ণ তাহার কোল হইতে নামে নাই, কুমারহাটিতে ফিরিবার সময় তাহার মন খারাপ হইয়া গেল, সুবর্ণলতার হাসি তাহার সমস্ত সংকল্প ভাসাইয়া দিয়াছে।

আরো দুই বৎসর এইভাবেই কাটিল, কুমারহাটির দোকান তখনও চলিতেছে বটে, তবে কারখানা সম্প্রতি উঠিয়া যাওয়াতে কুঞ্জ'র অনেক টাকা লোকসান পড়িয়া গিয়াছে, আসল অবস্থা নন্দরাণী জানিত না

বলিয়াই দোকানটি এত দিন বন্ধ হয় নাই। এই সময়ে কুঞ্জ সংবাদ পাইল নন্দরাণীর সংসারে আর একটি নূতন প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে। এতদিনে তাহাদের নিজস্ব সন্তান হইল।

কুঞ্জ যেন ইহারই প্রতীক্ষায় ছিল, কয়েক দিন পরে দোকানপাট তুলিয়া দিয়া সে সোজা মকিমপুরে ফিরিয়া আসিল। নন্দরাণী বিস্মিত হইয়া কহিল—

—কিগো এত জিনিস পত্তর কিসের, হঠাৎ এমন অসময় ?

কুঞ্জ কহিল—অসময় আর সুসময় কি ? দোকান-টোকান আর কি হবে ? তুমি একা-একা কি করেই বা ছেলে মেয়ে সাম্‌লাবে, তাই ভাব্‌লাম বাড়ীতেই এখন দিন কতক থাকা যাক্। এ দিকটাও ত' দেখ্‌তে হবে—

নন্দরাণী বুঝিল কারবার নষ্ট হইয়াছে। অপরাধ খণ্ডন করিবার সময় নানা কথায় আসল বক্তব্য চাপা দেওয়াই কুঞ্জর স্বভাব।

কুমারহাটির দোকান উঠিয়া যাইবার মাসখানেকের মধ্যেই মকিমপুরের বাসা তুলিয়া বঙ্কিরহাটে নূতন বাড়ী কেনা হইল। মাসিক বন্দোবস্ত অনুযায়ী যাহা পাওয়া যাইত তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। দুর্দ্দিনের সম্বল হিসাবে কুঞ্জকে লুকাইয়া তাহাই নন্দরাণী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। জগদীশবাবুর হাতে একদিন সেইগুলি তুলিয়া দিয়া সে তাঁহার পা' দুটি জড়াইয়া ধরিল, কহিল—একটা মাথা গোঁজবার জায়গা আপনি আমাদের করে দিন, এভাবে পরের মুখ চেয়ে আর ক'দিন থাক্‌বো !

জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন—কথাটা আমিও ভেবেছি, এ টাকায় আর কি হবে, টাকার জন্য চিন্তা নেই, সুবিধে পেলেই একটা যা হয় বন্দোবস্ত করে দেব।

নন্দরাণী তবু ছাড়িল না, কতকটা যেন বায়না হিসাবেই সেই

টাকাগুলি জগদীশবাবুকে গছাইয়া দিল, কহিল—তবু আপনার মনে থাক্‌বে, নইলে আপনি পাঁচ কাজের মানুষ, একি আর একটা মনে রাখ্‌বার মতো কথা!

জগদীশবাবু তেমনই হাসিয়া বলিলেন—তোমার কাছেই আমি হার মেনেছি মা, বাড়ী আমার সন্ধানে একটা আছে, শীগ্‌গিরই বোধ করি গৃহ-প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো!

দীর্ঘকাল আসা যাওয়ার ফলে নন্দরাণীর ওপর জগদীশবাবুর একটা গভীর মমতা জন্মিয়াছে, জহর ও সুবর্ণকে মানুষ করিতে স্বীকৃত হইয়া নন্দরাণী জগদীশবাবুকে অনেকখানি দায়িত্বভার মুক্ত করিয়াছে। জহর ও সুবর্ণের টাকাতে তাই একদিন বক্সীরগাটের বাড়ীখানি সহজেই কেনা হইয়া গেল।

অত বড় বাড়ীটি যে সত্যই তাহাদের তাহা যেন কুঞ্জ'র আর বিশ্বাস হয় না। এখন ত' তাহারা রীতিমত বড়লোক, নূতন শহরে, নূতন পরিবেশের মধ্যে, নূতনভাবেই নিজেদের গড়িয়া তুলিতে হইবে, এমনই একটা ধারণায় কিছুদিন সে যেন আর মর্ত্ত্যলোকে রহিল না। নন্দরাণী কড়া গৃহিণী, সকল দিকেই তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি; একদিন কুঞ্জকে বলিয়া বসিল, দোকান করে লাভের মধ্যে ত' দেখছি, কতকগুলো বে-চাল শিখেছ, তখনই তাই বলেছিলুম—

কুঞ্জ আকাশ হইতে পড়িল! কহিল, বেচালটা কোথায় দেখ্‌লে বউ, ওঃ গান গাইছিলুম বলে বুঝি?

নন্দরাণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—রঙ্গ রাখো, জহর আর সুবর্ণ বড় হয়েছে, অনীতাটিও দু'দিন বাদেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌বে, এখন তুমি কোথায় একটু গম্ভীর হবে—তা নয়, যতো সব—

এই মৃদু তিরস্কারেই কুঞ্জবিহারী মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিল।

কুমারহাটির দোকান তুলিয়া দিবার পর এই প্রথম সে বুঝিল কয়েক বছরে তাহার বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, জীবন সেই ভাবেই আছে, সংসার বৈচিত্র্যহীন গতিতেই চলিতেছে। তবে বয়স কিঞ্চিৎ বাড়িয়া গিয়াছে, নন্দরাণীর চোখের কোণে সে কটাক্ষ অন্তর্হিত হইয়াছে, দেহে সে বিদ্যুৎ নাই। অকস্মাৎ বড়লোকের পদে প্রমোশন পাইয়া বাধা ও নিষেধের দুর্ভেদ্য ব্যূহজালে ক্রমশঃই যেন তাহারা জড়াইয়া পড়িতেছে।

ছেলেমেয়েদের কিন্তু কুঞ্জ সত্যই ভালোবাসে। ছেলেরা না থাকিলে সংসারের এই গোলাপী আমেজে না ডুবিয়া এতদিনে সে হয়ত' তাহার প্রাক্তন উদ্দাম জীবনে ফিরিয়া যাইত।

মাটির ধরণীতে স্বর্গ রচনা করিবার কল্পনাতেই হয়ত' নন্দরাণী সে দিন নীড় বাঁধিয়াছিল।

অতীতের স্মৃতি আজ তাহার চোখের জলের বাঁধ ভাঙিয়াছে। কুঞ্জ সহরে গিয়াছে, সন্ধ্যার মধ্যেই ছেলেমেয়েরা আসিয়া পড়িবে, তবু নন্দরাণীর মনে সুখ নাই।

হয়ত' এই কারণেই সহরের পথে পথে কুঞ্জ অকারণে সময় কাটাইয়া ফিরিতেছে, তাহার অন্তরেও আজ আর শান্তি নাই।

এ সংসারের মধ্যমণি সুবর্ণ। একবার দেখিলে হয়ত' দ্বিতীয়বার দেখিবার বাসনা না হইতে পারে, কিন্তু দেখিলে এই প্রশ্নই বারবার মনে হইবে কেন সুবর্ণ বিনিঃশেষে আপনাকে প্রকৃতির হাতে এমন করিয়া সমর্পণ করিয়াছে? শারীরিক সৌন্দর্য্যকে কেন সে স্বেচ্ছায় গোপন করিয়া রাখিয়াছে? কেশের কমনীয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা নাই, চোখ দু'টি করুণা ও সহানুভূতিতে দীপ্ত, কিন্তু সুর্ম্মা সংস্পর্শে সংস্কৃত নয়, সারা দেহে কোথাও এতটুকু প্রসাধন-পারিপাট্য নাই, অথচ সে বর্ষা-বিস্ফারিত নদীর মতোই অনস্বীকার্য্য। আপন মহিমাতে মহিমামণ্ডিত বলিয়াই বোধ

করি প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বাভাবিক বর্ণচ্ছটা ভিন্ন আকৃতির সৌষ্ঠব বর্দ্ধনে আর কিছুরই সাহায্য সুবর্ণ গ্রহণ করে নাই। সংসারে আপন স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুবর্ণ তাই অনন্যা।

কিন্তু মধ্যমা বলিয়া তাহাকে অনেক কিছুই সহিতে হয়। প্রথমতম বলিয়া নয়, ছেলে বলিয়া এ সংসারে জহরের প্রাধান্য বড় কম নয়, অপর দিকে অনীতা—কনিষ্ঠা হিসাবে তাহার আদরের পরিমাণ কিছু বেশী, তা' ছাড়া তাহার সৌন্দর্য্যের প্রাখর্য্য সুবর্ণকে অনেকখানি ম্লান করিয়া দিযাছে। অনীতার রূপের খ্যাতি আছে, আর সে-সংবাদটুকু অনীতা ভালো করিযাই জানে।

জীবনের সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে ভাব-বিলাসের অবসর নাই, বাস্তবের রূঢ় রুক্ষ বিভীষিকা সহজভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে একথা সুবর্ণ বুঝিয়াছে। সুবর্ণর প্রখর কর্ত্তব্যবোধের জন্যই নন্দরাণীর সংসারে এখনও অবিচ্ছেদ্য সংযোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। জহর ও অনীতাকে ভাই-বোন বলিযা না জানিলে সুবর্ণ কি করিত বলা যায় না, তবে তাহাদের আপন ভাই-বোন বলিযা জানে বলিয়াই বোধ করি ইহাদের প্রাকৃতিক বিভিন্নতা তাহার ভালোবাসার অন্তরায় হইয়া উঠে নাই।

বড় ভাই জহর কোষমুক্ত তরবারির মতোই প্রখর ও প্রচণ্ড, সব সমযই সে কিছু-না-কিছু কাজে ব্যস্ত। লাইব্রেরী, টেনিস ক্লাব, সেবাসমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সম্পূর্ণ হওয়াতে সে ইদানীং রাজনৈতিক দল লইয়া মাতিয়াছে। আর ছোটবোন অনীতা নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত। অনীতার মধুর স্বভাবে সুবর্ণ মুগ্ধ।

সুবর্ণর ভক্তি ও শ্রদ্ধা চরমে উঠিযাছে কুঞ্জ ও নন্দরাণীর সম্পর্কে। বাবা ও মাকে সে সকলের উপরে দেখে, কুঞ্জর সহস্র ত্রুটি সে নন্দরাণীর কাছে গোপন করিয়া রাখে, আর জননী নন্দরাণীকে সে

শাসনতন্ত্রের মতো সুদৃঢ়, নিরাপদ এবং কল্যাণময়ী বলিয়াই জানে।

এ সংসারে তাই সুবর্ণকে সকলেরই প্রয়োজন।

কথা ছিল হোয়াইটওয়েরে ঘড়ির তলায় সুবর্ণ তিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। জহরের অফিসের ছুটি হয় আড়াইটায়, তারপর দু'জনে এক সঙ্গে ৩-৪৫এর ট্রেণে বক্সীরহাট যাইবে। সুবর্ণ অনেক আগেই আসিয়াছিল, জহর আসিল সাড়ে তিনটার পর।

সুবর্ণ কহিল—দাদা, তোমার সব তাতেই দেরী, এখন কি শিয়ালদা গিয়ে ৩-৪৫এর ট্রেণ ধরা যাবে?

জহর বলিল—ভয় কি? টিকিট কাটা আছে। এখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিই, তাহলেই ঠিক হবে। আপিসে আজ ভারি মজা হয়েছে, বুঝ্‌লি সুবি—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই একটি ট্যাক্সি ডাকিয়া উভয়ে উঠিয়া বসিল—

তারপর জহর সুবর্ণকে বলিল, ষ্টেশনে মালপত্তর পাঠিয়েছিস ত'—দেখিস্, তা নইলে কিন্তু আর এ ট্রেণ ধরা যাবে না।

সুবর্ণ হাসিয়া বলিল—আমাদের আজ সকাল সকাল ছুটি হয়েছিল, বাসায় গিয়ে সব গুছিয়ে তবে এখানে এসেছি। তোমার আপিসে কি হয়েছে বলো না দাদা?

জহর বলিল—তোর কি মনে হয়?

সুবর্ণ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—মাইনে বেড়েছে?

জহর খুসী হইয়া বলিল—ব্রিলিয়াণ্ট্, শুধু মাইনে বাড়া নয়, National Gas Company'র এলাহাবাদের ম্যানেজার,—ছুটির পর থেকেই—

সুবর্ণ কতকটা ক্ষীণ কণ্ঠেই বলিল—দাদা, আমারও মাইনে বেড়েছে, ছুটির পর থেকে হেড্ মিস্ট্রেস হবো, নব্বুই দেবে শুন্‌ছি—

জহর একটু গম্ভীর হইয়া গেল বলিল, বলিস্ কিরে সুবি! কল্‌কাতায় বসেই নব্বুই? আর আমি এলাহাবাদে মোটে দেড়শ', না মেয়েগুলো ডোবালে দেখ্‌ছি!

সুবর্ণ যেন দাদার ব্যথা বুঝিল, কহিল, তোমার হোল কোম্পানীর ব্যবসা, আর আমাদের সাধারণের পয়সা। তাই দিতে পারে, তা ছাড়া এখনও কিছু পাকাপাকি হয় নি। তারপর এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্যই বলে, তোমার রিপাব্লিকান্ দলের কাজ কি করে চল্‌বে দাদা?

জহর উৎসাহভরে বলিল—কাজের আবার অভাব? এলাহাবাদ ত' পীঠস্থান, ওখানে একটা গোলমাল চল্‌ছে, এখন সেখানে গেলে আমারই ত' সুবিধে—

ট্যাক্সি শিয়ালদায় পৌছিল...

ছেলেমেয়েদের আগমন-প্রতীক্ষায় নন্দরাণী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। যে দুঃসহ চিন্তা সকাল হইতে নন্দরাণীর সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, এই কর্ম্মহীন সন্ধ্যায় তাহাই তাহাকে বারবার পীড়ন করিতে লাগিল। বছর দুই আগে একুশ বছর বয়স অতিক্রম করার সময় জহরকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার একটা কথা উঠিয়াছিল, তখন কিন্তু বলি-বলি করিয়াও কুঞ্জ বা নন্দরাণী কেহই সে কথা বলিতে পারে নাই। আজ-কাল করিয়া তাহার পর অনেক দিন কাটিয়া গেল। এদিকে সুবর্ণও ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রী কোন দিন বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই, বরং তাহাদের উৎসাহের আতিশয্যে অনেকে বিস্মিত হইয়াছে, কিন্তু গোপনে দরখাস্ত

পাঠাইয়া সুবর্ণ যেদিন কলিকাতায় একটি মাষ্টারী জুটাইয়া ফেলিল, সেদিন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আপত্তি করিয়াছিল। কুঞ্জকে রাজী করিতে সুবর্ণর বেশী কষ্ট হয় নাই, কিন্তু সুবর্ণর চোখের জল দেখিয়াই নন্দরাণীকে অবশেষে বাধ্য হইয়া মত দিতে হইয়াছিল।

সুবর্ণ বলিয়াছিল—তবু ত' লেখাপড়া নিয়েই থাক্‌বো মা, বাড়ীতে বসে থাক্‌লে দু'দিনেই পড়ার পাট উঠে যাবে।

নন্দরাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—ভেবেছিলুম এতদিনে তবু সুবীকে আবার কাছে পেলুম! অনী রইলো হোষ্টেলে, জহরের চাকরী, আমার যে বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগে মা। সুবর্ণ যে মা'র ব্যথা বুঝিতে পারে নাই তাহা নহে, তবু সংসারের সাহায্য করিতে পারিবে, এই আশায় চাকরীর মায়া ছাড়িতে পারিল না, সে বলিয়াছিল—আমি তোমার কাছেই আছি মা, দাদা আর আমি এক বাসাতেই থাক্‌বো। এক দিন অন্তর চিঠি দেব, ছুটি পেলেই ছুটে আসবো।

সুবর্ণ সেদিন মিথ্যা বলে নাই। নিয়মিত চিঠি দিয়া সে নন্দরাণীকে অনেকটা শান্ত রাখিয়াছে।

জহর বা সুবর্ণর বিবাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে গুরুতর সমস্যা বর্ত্তমান, সে কথা জগদীশবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পাইবার পর সর্ব্বপ্রথম নন্দরাণীর খেয়াল হইল। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া কোনও কূল-কিনারা করিতে পারিল না। আর সব ব্যাপার চাপা দিয়া জহরের বিবাহের একটা ব্যবস্থা করা হয়ত' সম্ভব, কিন্তু তাহাদের সমাজে এমন বয়স্থা ও শিক্ষিতা মেয়ের উপযুক্ত পাত্র মিলিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই, এত দিন কোনো চেষ্টাই হয় নাই। এবার কিন্তু কুঞ্জ জেদ ধরিয়াছে সুবর্ণর বিবাহের। খোলাখুলি সবকথা বলিয়া ফেলাই ভালো, দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া বসিয়া থাকা ঠিক নয়। তাহা হইলে তবু হয়ত' কোনো একটা উপায় হইতে পারে।

কথাটা প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করার প্রয়োজন নন্দরাণী অস্বীকার করে না, কিন্তু কাহার দুর্লঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে যেন নন্দরাণী কিছুতেই নিজেকে ভারমুক্ত করিতে পারিতেছে না। এই দীর্ঘকাল সে জহর ও সুবর্ণর জননী সাজিয়া কাটাইয়া সত্যই তাহাদের জননী হইয়া গিয়াছে। নন্দরাণী এ সংসারের সংযোগ-সেতু। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই পারস্পরিক প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন আজো অটুট রহিয়াছে। আজ স্বেচ্ছায় সেই সংযোগ-সূত্র ছিন্ন করিবার সাহস তাহার নাই, অথচ এই অপ্রতিরোধ্য সমস্যার একটা সমাধান করিতেই হইবে।

অনেকগুলি বোঝা লইয়া কুঞ্জ শহর হইতে ফিরিল প্রায় সন্ধ্যার পর। নন্দরাণীকে রাশীভূত নির্জ্জীবতার মতো চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কুঞ্জর সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল। সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিয়া কুঞ্জ কতকটা আপন মনেই যেন বলিল—জহর আর সুবী এতক্ষণে অর্দ্ধেক পথ এসে গেল, অনীটা কি করবে কে জানে? ছুটি হোল, সোজা বাড়ী চলে আয় বাপু! তা নয়, রেণুদের সঙ্গে কার্শিয়ং যাবো, রমলাদির সঙ্গে পুরী যাবো, যত বায়নাক্কা মেয়ের—

নন্দরাণী শুষ্ককণ্ঠে কহিল—অনীও আসবে, আজ বিকেলে চিঠি এসেছে, সাড়ে আট্‌টার ভেতর পৌছবে।

নন্দরাণীর নিষ্প্রাণ উত্তরে কুঞ্জ বিস্মিত হইল না। তাহার এ মনোবেদনার কারণ কুঞ্জ জানে বলিয়া কথা ঘুরাইবার জন্য বলিয়া উঠে—পূজোর বাজার, বুঝলে গো, যার পয়সা আছে তারই পূজো। দোকানগুলো এমন সাজিয়েছে যে, ইচ্ছে করে সারা দোকানটাই কিনে নিয়ে আসি। এখন পূজোর ক'টা দিন বৃষ্টি না হলেই হয়। যা জল এ বছর—

নন্দরাণী এ কথার কোনো উত্তর দিল না।

কুঞ্জ আপন মনে শহর হইতে আনীত প্যাকেটগুলি খুলিতে লাগিল।

কিন্তু চুপ করিয়া কতক্ষণই বা থাকা যায়! সহসা বলিয়া উঠিল—চক্রবর্ত্তীবাবুরা যে পূজোর পর চলে যাবেন বল্‌ছেন, যাই বলো বাপু বেশ লোক, এমন ভাড়াটে আর পাওয়া যাবে না।

কথাটি বলিয়া ফেলিযাই কুঞ্জ বুঝিল কাজটা ভাল হয় নাই। মুখের কথা থামিতে না থামিতেই নন্দরাণী বলিযা উঠিল—কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি বাড়ীতে ভাড়াটে রাখতে হবে। চায়ের দোকান, মাছের কারবার, একটা না একটা তোমার লেগেই আছে—

—মাছের কারবার ত' পয়সা উড়িযে দেবার জন্য করি নি, কষ্ট নইলে কেষ্ট মেলে না। অদৃষ্টে নেই ত' আমি কি করবো বলো?

—তাই কেষ্ট মেলবার জন্য বুঝি ঘরের কড়ি উড়িযে দিযে আসতে হবে?

কুঞ্জ কোনো কথা না বলিযা প্যাকেটগুলি তুলিয়া ঘরের ভিতর চলিযা গেল। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিযা দেখিল, নন্দরাণী শূন্যদৃষ্টিতে উদাসভঙ্গীতে তেমনই বসিযা আছে। নন্দরাণীকে এমন ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখাইতেছে যে কুঞ্জ সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে আর উপেক্ষা করিতে পারিল না, উদ্বিগ্ন কুঞ্জ কাছে আসিযা সস্নেহে বলিল—রাগ কোরো না বউ, জহর বড় হযেছে, সংসারের ব্যবস্থা সেই কর্‌বে। নন্দরাণী মুখ ফিরাইয়া ক্ষণিকের জন্য স্বামীর দিকে চাহিল, সেই দৃষ্টিতে এমন আবেদন ছিল যাহা কুঞ্জর অন্তরে বিস্মৃত যৌবনের প্রথম শিহরণ আনিয়া দিল। যে আতঙ্কিত অস্পষ্টতার বিভীষিকা নন্দরাণীকে দহন করিতেছে তাহা কুঞ্জ জানে, তাই সে কোমল কণ্ঠে কহিল—তোমার কি হয়েছে বউ আমি জানি, মিছিমিছি ভেবে মন খারাপ করে আর কি লাভ বলো!

নন্দরাণী মাথা নাড়িল মাত্র, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কুঞ্জ আবার বলিল—পূজোর সময় না হয ও সব কথা নাই বলা হোল, এতদিন গেল আর দু'চার মাস কাট্‌লেই বা ক্ষতি কি?

—না বল্‌তেই হবে, কর্ত্তব্যকে তুমি ক'দিন আর ঠেকিয়ে রাখ্‌বে? দৃঢ়কণ্ঠে নন্দরাণী বলিল।

অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে কুঞ্জ কহিল—কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য, বড় বড় কথা বলে আমরা ভালোর চেয়ে খারাপটাই বেশী করি।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে নন্দরাণীর বিবেক কহিল, কিন্তু ওদেরও ত' সব কথা জানা দরকার, সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন?

—তাতে লাভটা কি হবে শুনি? কে ওদের বাপ মা বল্‌তে পার্‌বে? এত কাণ্ড করে কি বল্‌বো, না তোমাদের কোনো সত্যিকার বাপ মা নেই। আমরা দিতে কিছুই পার্‌বো না উলটে নিযে নেব যে অনেক বেশী।

—সেবারেও জহরকে বলার সময় তুমি এমনই বলেছিলে, যেটা কর্ত্তব্য সেটা পালন কর্‌তেই হবে, সেই জন্যেই আমি মন স্থির করে ফেলেছি এবার বল্‌বো, বুকের ভেতব আর যে গুম্‌রে মরতে পারি না।

নন্দরাণী কাঁদিযা ভাঙ্গিযা পড়িল, ঠিক সেই সময়েই সদরে কড়া নড়িয়া উঠিল। কুঞ্জ তাড়াতাড়ি বলিল—চোখ মোছ, ছেলেরা এল, একটা কথা বলি তোমাকে, বল্‌তেই যদি হয়, অনী আস্‌বার আগেই তা শেষ কর্‌তে হবে।

নন্দরাণী কুঞ্জর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল—সে আমি বুঝ্‌বো'খন, এটা ভুলো না, যাই বলা হোক্, ছেলে মেযে আমার, ওদের আমি কিছুতেই ছাড়্‌তে পার্‌বো না।

কযেক মিনিট পরে বাড়ীতে আনন্দের প্লাবন বহিযা গেল। জহর ও সুবর্ণ বাবা মাকে প্রণাম করিবার পর যথারীতি কুশল প্রশ্ন সুরু হইল।

সুবর্ণ কহিল—মা তোমার শরীরটা বড্ড খারাপ হযে গেছে বাপু, একলা সমস্ত কাজ কর্‌বে, একটা লোক রাখ্‌লেই ত' পারো—

সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া নন্দরাণী কহিল—এবার অনেক দিন পরে দেখ্‌ছিস্‌ কিনা তাই, ওঁর সঙ্গে কথা ক'—আমি চট্‌ করে ওপর থেকে তোদের জলখাবার নিয়ে আসি। জহর, হাত মুখ ধুয়ে নাও বাবা—

কুঞ্জ এতক্ষণ সুবর্ণ ও জহরকে শান্তভাবে লক্ষ্য করিতেছিল, নন্দরাণী চলিয়া যাইবার পর সুবর্ণকে প্রশ্ন করিল—কল্‌কাতায় পূজোর বাজার বেশ জমেছে, না মা, দোকান টোকান খুব সাজিয়েছে—?

সুবর্ণ বলিল—দোকান মন্দ সাজায়নি, যেমন বরাবর সাজায়—তবে এবার তেমন ভীড় নেই বাবা।

জহর সুটকেস্‌ খুলিয়া কতকগুলি প্যাকেট বাহির করিতেছিল, সেগুলি নজরে পড়িতে কুঞ্জ বলিল, এই দেখ কাণ্ড, ওসব আবার কি আন্‌লে ?

সুবর্ণ হাসিয়া কহিল—দাদা, ও সব আজ আর বার কোরো না, বাবা আবার এখনই হৈ চৈ সুরু করে দেবেন।

জহরের সঙ্গে কথা কহিতে কুঞ্জ ইদানীং কেমন সঙ্কোচ বোধ করে, জহর এখন পাকা মুরুব্বী বনিয়া গিয়াছে। কুঞ্জ বলিল—আফিসের খবর কি জহর, খুব খাটুনি হচ্ছে ত' ?

জহর বলিল—খবর তেমন খারাপ নয় বাবা, তবে একটু আধটু হাঙ্গামা ত' লেগেই আছে। মাড়োয়ারীর কারবার, বাঙালীকে ত' আজকাল কেউ দেখতেই পারে না, যতটা পারে হটিয়ে রাখ্‌তে চায়, আমাকে ত' পূজোর পর থেকে এলাহাবাদে বদলী কর্‌বে ঠিক হয়েছে।

—যতটা পার্‌বে সাম্‌লে নিয়ো, কিন্তু এলাহাবাদ ত' অনেক দূর—

সুবর্ণ কহিল—দাদাকে ওরা ম্যানেজার করে পাঠাচ্ছে, মাইনেও বেশী।

জহরের মুখখানি দেখিয়া মনে হইল সে বড়ই পরিশ্রান্ত, কুঞ্জ তাই এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়া কহিল, ওসব কথা পরে ধীরে সুস্থে হবে'খন, সেই কখন গাড়ীতে চেপেছ, মুখ-টুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে।

সুবর্ণ বলিল—অনী কখন আসবে বাবা, চিঠি দেয়নি কিছু ?

কুঞ্জ হাসিল, অনীর কথা আর বোলো না, প্রথমটা খবর দিয়েছিল আসবে না, একবার বলে কার্শিয়ং যাবো, একবার কাশী পুরী, তা তোমার মা কড়া করে বোধ হয় কিছু লিখে থাকবেন, এখন শুনছি সাড়ে আটটার গাড়িতে আসছে। এইটুকু মেয়ে কত তার বন্ধুবান্ধব, এখন ভালোয় ভালোয় এসে পড়লে বাঁচি, যে মেয়ে—

সুবর্ণ বলিল—ওই ত' ওর দোষ, ভালো করে একটা চিঠিও লেখে না, লিখলে ত' গোনা দু'লাইন, "একটা নতুন ডিসাইনের ব্লাউজ পাঠিয়ো, মুক্তিতে কাননবালা যেমন পরেছিল। আজ বড় তাড়াতাড়ি, পরে আবার চিঠি দিচ্ছি" ব্যাস ঐ পর্য্যন্ত, আর খবর-ই নেই।

জহর বলিল—সে আবার কিরে সুবী, কি ব্লাউজ বল্লি ?

সুবর্ণ হাসিয়া কহিল—কাননবালা-ব্লাউজ। নতুন ডিজাইন, ও সব তুমি বুঝবে না।

—বুঝেও দরকার নেই। দিন দিন যা হচ্ছে সব, অনীটা খুব সিনেমা দেখছে, না ?

এ কথা চাপা দিবার জন্য কুঞ্জ বলে—পাগল আর কি, ছেলেমানুষ !

জহর তবু ছাড়িবে না, প্রশ্ন করে—কার সঙ্গে কার্শিয়ং যাবে বলছিল ? মা ঠিকই করেছে, ওকে একটু শাসন করা দরকার—

শান্তকণ্ঠে সুবর্ণ বলে—কি যে বলো দাদা, শাসন করবে কি, ছোটবেলায় সবাই অমনি থাকে। তুমি যে বাঙালীর ছেলে হয়ে পাঞ্জাবীর ওপর জওহরলালী ওয়েষ্ট কোট্ চাপাও, সেই বা কি ফ্যাসান—?

জহর ইহাতেও শান্ত হইতে চায় না, সে আরো কি বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় নন্দরাণী আসিয়া পড়ায় আলোচনা থামিয়া গেল।

নন্দরাণী জলখাবারের থালা সাজাইতে সাজাইতে বলিল—মাথায়

দেখ্‌ছি দুজনেই বেশ লম্বা হয়েছ, শরীরে কিন্তু গত্তি লাগেনি এক রত্তি, জহর ত' একেবারে যেন তালগাছ—

জহর বলিল—মা একটা সুখবর আছে, কিরে সুবি সুখবর নয় ?

উদ্বিগ্ন নন্দরাণী সভয়ে কহিল—তোমার সুখবরে ভয় করে বাবা, স্বদেশীর ব্যাপার বুঝি ? সেবার অমনি সুখবর বলে যে কাণ্ডটা বাধালে, ভয়ে বাঁচি না, থানা পুলিস।

জহর হাসিয়া ফাটিয়া পড়িল, তোমার কেবল থানা আর পুলিস মা, তা নয় আমাদের দুজনেরই মাইনে বেড়েছে, সুখবর নয় ?

নন্দরাণী তবুও সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, কি জানি বাবা, তোর কথা আমি সব বুঝ্‌তে পারি না—

জহর বলিল, আমি গ্যাস কোম্পানীর এলাহাবাদের ম্যানেজার হয়ে যাচ্ছি, আর সুবী নব্বুই টাকায় হেড্‌মাষ্টারণী হবে পূজোর পর থেকেই, আমার চেয়ে কিছু কম।

নন্দরাণী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল, কহিল, তোরা আমার রত্ন ছেলে মেয়ে, এ আমি বরাবরই জান্‌তুম বাবা।—তোরা হাত মুখে জল দিয়ে ওপরে আয়, আমি জলখাবার ঠিক করে রাখ্‌ছি, অনী এসে পড়্‌লেই হয় এখন !

জিনিস পত্র গোছাইয়া জহর ও সুবর্ণ উপরে উঠিয়া গেল।

নন্দরাণী কুঞ্জকে বলিল, কি দরের মানুষ আমরা, কি আমাদের বরাত বলো ! সত্যি সুখবর বল্‌তে হবে, তবে ঐ এলাহাবাদ না কি বল্লে, ওই জন্যেই যা আমাদের ভয়। কল্‌কাতা তবু কাছে-পিঠে, খবর না পেলে দৌড়ে যাওয়া চলে, কোথায় কোন্ বিদেশে যেতে হবে।

কুঞ্জ শুধু বলিল—সোনার চাঁদ ছেলে, তবে এ কথাও বলি বাপু,

এমন . বাপ মা পেয়েছিল বলেই ত' দাঁড়িয়ে গেল, নইলে আজ কি হ'ত ?

এ কথায় নন্দরাণী শুধু বক্রদৃষ্টিতে কুঞ্জর দিকে একবার চাহিল মাত্র, কোনো মন্তব্য করিল না, তারপর ধীরে ধীরে নৈশ আহারের আয়োজন করিতেই হযত উঠিয়া গেল ।

কাজকর্ম্ম সারিয়া ঘড়ির দিকে চাহিতেই নন্দরাণীর মুখ গম্ভীর হইয়া গেল । ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কুঞ্জকে বলিল—এখনও কিন্তু অনীটা এলো না, সকলে এক সঙ্গে আসবে, আমোদ আহ্লাদ করবে, তা নয়. কি করে বেড়াচ্ছে কে জানে !

কুঞ্জ প্রতিবাদ করিযা বলিল—তোমার যত সব উদ্ভট ভাবনা, এতখানি পথ আসবে, সময লাগবে না ? ওকে তুমি মোটেই দেখতে পারো না—

উদ্বিগ্ন নন্দরাণী এ-কথার কোনো উত্তর করিল না । অনীতার আগমন প্রতীক্ষায সদর দরজায দাঁড়াইতে গেল । কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না, তুলসী মঞ্চের কাছাকাছি যাইতেই দেখিল এক সুদর্শন ভদ্র যুবক সোজা বাড়ীর ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে । পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য লক্ষ্য করিবার মতো বটে, কিন্তু নন্দরাণীর তাহা দেখিবার মত মনের অবস্থা নয, সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, বলা নেই কওয়া নেই আপনি সোজা বাড়ীর ভেতর চলে এলেন যে,—কি চাই আপনার ?

নন্দরাণীর কথা শুনিতে পাইযা কুঞ্জও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল. কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না, বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে এই অপরিচিত লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ।

যুবকটি এবার প্রায নন্দরাণীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, আমার হয়ত' একটু দোষ হয়েছে । কিন্তু ওপরের বারান্দা থেকে আপনাদের মেয়ে আমাকে ভেতরে আসতে

বল্লেন বলেই আমি বাড়ীর ভেতর চলে এসেছি। আপনাদের কাছে আমার একটু জরুরী প্রয়োজন রয়েছে তাই।

ভদ্রলোকের হাতে প্রশস্ত ডেস্‌প্যাচ কেস্‌টি লক্ষ্য করিয়া নন্দরাণী আন্দাজে একটা ভুল ধারণা করিয়া বসিল, কহিল, আমরা দোরে কোনো জিনিষ কিনি না।

কুণ্ঠিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন—আমি সেজন্যে আসিনি, আমার কথাটা একটু শুনুন—

কুঞ্জ এতক্ষণে কহিল—ও বুঝেছি, বাড়ী ভাড়ার জন্যে এসেছেন? তা পূজোর আগে ত' বাড়ী খালি হবে না।

ভদ্রলোকের সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়, তিনি বিনীত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—কথাটা শুনুন আগে, আমি কিছু বিক্রী কর্‌তেও আনিনি, বাড়ী ভাড়া নিতেও আসিনি, কুঞ্জবাবু আপনার কাছেই আমার বিশেষ কথা আছে। আমার বাবা জগদীশ চৌধুরীকে আপনারা দু'জনেই চিন্‌তেন, আমার নাম অলক চৌধুরী, কিন্তু আমাকে কখনও হয়ত' দেখেন নি।

জগদীশবাবুর নাম শুনিয়া কুঞ্জ সৌজন্যের খাতিরে বলিল—ভেতরে আসুন, এখানে দাঁড়িয়ে ত' আর কথা হবে না।

নন্দরাণী নিষ্পলক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, অনুভূতিহীন অসীম শূন্যতায় তাহার অন্তর ভরিয়া গেল।

স্থান কাল ভুলিয়া নন্দরাণী সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

৫

ঘরের ভিতরে আসিয়া কেহই কিছুক্ষণ আর কথা কহিতে পারিল না। বিস্ময়ের প্রাথমিক ঘোর কাটিবার পর কুঞ্জই প্রথমে বলিল—

জগদীশবাবুর কাছে আপনার কথা কখনও শুনিনি, অনেক কথাই ত' হ'ত—

অলক সলজ্জ ভঙ্গীতে হাসিয়া পকেট হইতে একটি কার্ড বাহির করিয়া কুঞ্জকে দিল, তারপর অনুরুদ্ধ না হইয়াই চেয়ারে বসিতে বসিতে বলিল—তাঁর মত সুচেহারার অধিকারী হতে পারিনি বটে, তবে তাঁর অনেক কাজের অধিকারী আমায় করে গেছেন, সে সব আমাকে যথাসাধ্য পালন করতেই হবে—

এত কথাতেও যেন নন্দরাণীর সন্দেহ মিটিল না, এমন কি মুদ্রিত কিছু দেখিলেই যে কুঞ্জ চিরদিন শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিত তাহারও আজ সন্দেহের ঘোর কাটিতেছে না। নন্দরাণী বলিয়া বসিল—আশ্চর্য্য কাণ্ড! এতবড় ছেলে অথচ আমরা কিছুই জানি না—

অলক বলিল—বরাবর আমি কল্‌কাতাতেই থাক্‌তুম, এটর্ণিসিপ্ পাশ কর্‌বার পর অল্প ক'দিনই তাঁর সঙ্গে ছিলুম, কাজেই আমার কথা আপনারা শোনেননি হয়ত! তবে আপনাদের সব কথাই আমি জানি, সে ভারও তিনি আমাকে দিয়েছেন—

নন্দরাণী এই কথার মধ্যে কিসের আভাষ পাইল কে জানে, সে শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—আমরা গরীব লোক, উকীল ব্যারিষ্টারে আমাদের কাজ নেই, এই যে তিন বছর একটি পয়সাও পাইনি, কারুর কাছে কি সেই নিয়ে দরবার করতে গিযেছি? আমাদের দরকারও নেই—

অলক কতকটা অসহিষ্ণু হইয়া কহিল—আমাকে কিছু বল্‌তে দিলে অনেকটা সময় হয়ত' বাঁচতো—

—আমি ত' আর বাধা দিইনি, আমি বল্‌তে চাই—

—আপনি স্থির হোন্ একটু—

এই কথায় নন্দরাণী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ হয়েছে গো, যা ভেবেছি তাই, অনীর আমার নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে!

বিশেষ বিব্রত হইয়া অলক বলিল—দেখুন অনী-টনী কাউকেই আমি জানি না, আপনি আমার কথাটাই আগে শুনুন না—

নন্দরাণী আত্মসংবরণ করিয়া সংক্ষেপে কহিল—অনী, মানে অনীতা—আমাদের ছোট খুকী—সাড়ে আট্‌টায় এসে পৌঁছবার কথা, কি হয়েছে তার বলুন—

অলক বলিল—দেখুন, এসব সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, তবে আপনার মেয়ের সম্পর্কে কোনো খবর নিয়ে আমি আসিনি, আমি জানাতে এসেছি যে অনেক টাকা হঠাৎ আপনাদের হাতে এসে পড়েছে—

এই কথায় স্বামী স্ত্রী উভযেই নির্ব্বোধের মত পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করিতে লাগিল, এই অর্থসংক্রান্ত সংবাদের অন্তর্নিহিত অর্থ যে কি হইতে পারে তাহা কেহই বুঝিযা উঠিতে পারিল না। নন্দরাণী কহিল—আ মা দে র টা কা ?

—হাঁ টাকা, অনেক টাকা, এটা নিশ্চয়ই সুসংবাদ! এখন আমার কথাটা একটু দয়া করে শুনুন।

এ কথায় নন্দরাণী কিঞ্চিৎ আত্মস্থ হইল বটে, কিন্তু অতীতের ব্যবসা সংক্রান্ত অসাফল্যের স্মৃতি কুঞ্জর মনে সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল,—সে চুপে চুপে নন্দরাণীকে কহিল—এও একটা কায়দা, একটু সাবধানে কথা কও!

অলক দেখিল নন্দরাণী তাহার কথায় এতক্ষণে মনোযোগী হইয়াছে, তাই সে নন্দরাণীকে বলিতে সুরু করিল—জহরকে আপনারা তার বাপের সম্বন্ধে কিছু বলেছেন কিনা আমি জানি না,—মানে তাঁর নাম, তিনি কে ছিলেন এই সব আর কি—

নন্দরাণী বলিল—আমাদের কেউ বলেও নি, আর আমরা জানতেও চাই না।

আকস্মিক উৎসাহভরে কুঞ্জ বলিল—তবে সুবর্ণর মাকে আমরা জানি। কেউ আমাদের বলেনি বটে, তবে না বল্লেও—

নন্দরাণী তীক্ষ্নদৃষ্টিতে কুঞ্জর দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি থামো, তারপর অলককে বলিল, টাকার কথা কি বল্‌ছিলেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অলক বলিল, জহরের বাবার নাম লোকনাথ মজুমদার,. রাণীভবানী কটন মিল্‌স, টেক্স্‌টাইল কনসার্ণ, ইণ্ডিয়ান ব্যাংকিং কর্পোরেশন এই সবের মালিক—

কুঞ্জ কহিল—রাজাবাবুর ভাগ্নে লোকনাথবাবু, তাঁকে ত' আমি চিনি, কি আশ্চর্য্য !

শঙ্কাকুল চিত্তে অলকের মুখের দিকে চাহিযা নন্দরাণী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিযা রহিল, তাহার অধিকার সংরক্ষণের জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে এমনই একটা দৃঢ়তার ভঙ্গী তাহাব উদ্বিগ্ন মুখে বর্ত্তমান—ভারী গলায় নন্দরাণী বলিল—এই ব্যাপার—তা, তিনি কি এখন টাকা দিয়ে তাঁদের ছেলে ফিরিযে নিতে চান ? তা যদি হয আমি আপনাকে স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি, সে সব হবে টবে না, জহর আমাদের, আমরা উকীল লাগিয়ে প্রমাণ করব, আমাদের ছেলে, যত টাকাই তাঁর থাকুক আর যত মিলেরই তিনি মালিক হোন্—ছেলেকে কেড়ে নিতে তিনি পারবেন না। আমি জহরকে মানুষ করে তুলেছি, লোকনাথবাবুর অন্য ছেলে আছে কিনা জানি না—যদি থাকে ত' জহরের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাও তাদের কোন দিন হবে না।

এতক্ষণ নন্দরাণীর মুখের দিকে অলক নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়াছিল। সে মুগ্ধ হইযা গিয়াছে, অল্পশিক্ষিতা সামান্য গ্রাম্যরমণীর মধ্যে এতখানি তেজ—এত মমতা থাকিতে পারে তাহা সে কোন দিন ভাবে নাই। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অলক বলিল, চমৎকার ! অদ্ভুত ! আপনার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আপনি মিথ্যা ভয় পাচ্ছেন —

কারণ নেই, আপনার জহরকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে না, অন্ততঃ আপনি যে ভাবে তাকে হারাবার ভয় করছেন সে ভাবে নয়। বিমান-দুর্ঘটনায় বামরৌলী এরোড্রোমের কাছে আজ সকালে লোকনাথবাবু মারা গিয়েছেন, সেই কথাই আমি বলতে এসেছি।

যে লোকটীর উপর রাগে ও আক্রোশে এখনই নন্দরাণীর মন তিক্ত হইযা উঠিযাছিল, এই মৃত্যু-সংবাদে তাহার সে জ্বালা প্রশমিত হইয়া গেল, আন্তরিক বেদনায ব্যথিত নন্দরাণী শুধু কহিল—আহা—!

অলক বলিল—ক্ষতি খুবই হয়েছে, তাঁর আত্মীয়স্বজনের শুধু ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে দেশের—ছেলেরা ত' আর তেমন মানুষ হোল না—

নন্দরাণী প্রশ্ন করিল—তাঁদের কি ব্যবস্থা করেছেন ?

অলক বলিল, তাদের আর কি বলুন, বাপের মৃত্যুতে বরং তারা খুসীই হোল, গরীবের পিতৃদায হলে তাদের সত্যিকাব কষ্ট হয়, কিন্তু বড়লোকেব মৃত্যুতে আত্মীযস্বজন, পুত্রপরিবার উৎসব করে। হাতে ক্ষমতা এল, ঐশ্বর্য্য এল, সম্মান এল। বাপ যেন পর্ব্বতের মত আড়াল দিযে সৌভাগ্যের স্যূর্য্য-কিরণকে এতকাল আটকে রেখেছিল—বড়লোকের ব্যাপারই আলাদা—

নন্দরাণী উৎকণ্ঠিত হইযা কহিল, তাহলে তাঁদের কি তিনি কিছু দিযে যান নি ?

—প্রচুর টাকা দিযে গেছেন, মারা যাবার বছর দুই আগেই সে সব ব্যবস্থা করেছিলেন, তখন এতটা বোঝেন নি। যাক্‌গে, সে কথায আর আমাদের কি বলুন, এদিকেও তিনি যা ব্যবস্থা করেছেন তাতে টাকা জহর পাবে না, আপনাদের দু'জনের নামে তিনি সব টাকাটা দিয়েছেন, তাঁর অবৈধ সন্তান জহরের নামে নয—

' নন্দরাণীকে আচ্ছন্নের মত দেখাইতেছিল, কতকগুলি টাকা এইভাবে [illegible] হাতে আসিয়া পড়াব তাহার এতটুকু আনন্দ হয় নাই, টাকার চাই না।

পরিমাণ বা তাহা পাইবার উপায় জানিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র ব্যগ্রতা নাই।

জহরকে অবৈধ সন্তান বলিয়া উল্লেখ করাতে নন্দরাণী বিশেষ বিরক্ত হইয়া কহিল—ওভাবে আপনি জহরের নাম ধর্‌বেন না, জহর আমার চাঁদের মত ছেলে, তবে একথাও বলি, লোকনাথবাবু টাকাটা ওর নামেই দিলে পার্‌তেন, আমাদের যে কেন দিতে গেলেন জানি না—

অলক কৌশলে ইহার জবাব দিল, বলিল,—সেই হয় ত' ঠিক হ'ত, কিন্তু দেখুন অল্প বয়সে এত টাকা ওর হাতে পড়াটাই কি আর ভালো হ'ত, বিশেষ যেখানে অর্থের স্বচ্ছলতা নেই। সেই কারণেই হয়ত' আপনাদের নামে দিয়ে গেছেন, আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। গরীব বা বড়লোক নিয়ে কথা নয়, আপনাদের মন তিনি জানতেন, আর আমারও মনে হয় তিনি ঠিকই করেছেন।

কুঞ্জ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, এইবার সে আর থাকিতে পারিল না, বলিল—যে কষ্টে জহরকে মানুষ করে তুলেছি তা'তে আমাদের কথাটা বিবেচনা করে তিনি ভালোই করেছেন। আমরা একদিনের জন্যেও ওকে পরের ছেলে মনে করিনি,—তারপর একটু থামিয়া নন্দরাণীর দিকে ফিরিয়া বলিল—তুমি বুঝি ভাব্‌ছো বউ, না জানি কত টাকাই আমাদের দিয়ে গেছেন তিনি, শেষ কালে হয়ত' দেখ্‌বে তেমন কিছুই নয়—

টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে নিজের কৌতূহল চাপিয়া রাখাটাই এখন ভালো দেখাইবে ভাবিয়া কুঞ্জ শেষের কথাগুলি বলিয়াছিল।

এ কথার পর অলক তাহার মুখের দিকে ধীরভাবে একটু চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল—টাকার পরিমাণ শুন্‌লে আপনারা সত্যই অবাক হয়ে যাবেন। তিনি যা আপনাদের দিয়ে গেছেন তা অনুমান করতেও পার্‌বেন না, এক লাখ টাকারও বেশী—

নন্দরাণী টেবিল ধরিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, এত টাকা সত্যই কুঞ্জর হিসাবে আসে না, সে উৎসাহভরে প্রায় চীৎকার করিয়া কহিল—সে যে অনেক টাকা, এক লাখ টাকার ওপর, লোকে কথায় বলে লাখ টাকা।

অলক গম্ভীর ভাবে বলিল—হ্যাঁ অনেক টাকাই বটে, তবে ইন্‌কম্ ট্যাক্স আছে, আরো কিছু কিছু খরচ আছে—

উপকথার সেই ব্যাঙের মত কুঞ্জ ফাটিয়া যাইবে নাকি, এত টাকা, এ যে তাহাদের ঐশ্বর্য্যের সপ্তম স্বর্গে লইয়া যাইবে। আনন্দে আত্মহারা কুঞ্জ নন্দরাণীর পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল—ভাড়াটেরা উঠে যাবে বল্‌ছিল, কালই ওদের নোটিশ দিচ্ছি—

নন্দরাণীর শ্রান্ত মুখখানি এই আনন্দের সংবাদে যেন আরো পাংশু হইয়া গিয়াছে, এই আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির উত্তেজনায় তাহার এক বিন্দু উৎসাহ নাই, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে কুঞ্জকে কহিল—সব বিষয়ে পাগলামী করো না, একটু চুপ করো—

আজ কিন্তু কুঞ্জকে থামাইবার সাধ্য নন্দরাণীর নাই। কুঞ্জ বলিল, তোমার মেজাজ কি কিছুতেই ভালো হবে না, জীবনে কোনো দিন এতবড় খবর শুনিনি বউ, আজ যদি না একটু পাগ্‌লামী কর্‌বো ত' সে পাগলামীর সময় আর কবে আস্‌বে? বল কি তুমি লাখ টাকার ওপর—!

নন্দরাণী নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলিল, আমি ভাব্‌ছি জহর-সুবর্ণর কথা, ওরা হয়ত' এর পর আর বিশ্বাসই কর্‌বে না যে আমরা কোনো দিন সত্য কথা বলতুম, আগে থাক্‌তে সব বল্লে আর কোনো গোল থাক্‌তো না—

লাখ টাকার ওপর যার হাতে, তাতে তার কি এসে যায়? নবাবী চালে কুঞ্জ বলে ওঠে।

তোমার কিছু না এসে যেতে পারে, কিন্তু আমার কাছে যে এইটাই সব চেয়ে বড়ো কথা। আমাদের যদি ওরা একটুও ভালোবাসে—আর

ওরা যে ভালোবাসে সে বিশ্বাস আমার আছে, তা হ'লে অনেক কিছুই মনে করতে পারে। তুমি চিরদিন অল্পতেই নেচে ওঠ, এই তোমার স্বভাব। টাকার কথা বলছ, উনি যা বল্‌ছেন তা যদি সত্যি হয় তাতেও আমার কিছু আসে যায় না। এতকাল যে ভাবে কেটেছে ভগবান জানেন এর পর কি দরকার আমার টাকার, ওসব আমি ভাবি না। জহর সুবর্ণর কি হবে সেই কথাই আমি খালি ভাব্‌ছি—

আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত অলক নন্দরাণীর কথাগুলি শুনিতেছিল, এতখানি সে আশা করিতে পারে নাই, পল্লীগ্রামের এই অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীর মধ্যে মাতৃত্বের যে এমন জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ সম্ভব তাহা নন্দরাণীকে না দেখিলে কোনো দিন অলক ভাবিতেও পারিত না। সে বলিল, ভাব্‌বেন না মা, আপনি যা ভয় করছেন তা হয়ত' শেষ পর্য্যন্ত না ঘটতেও পারে। এতখানি স্নেহ যে উপেক্ষা করে চলে' যেতে পারবে তার দুর্ভাগ্য যে আমি কল্পনাও কর্‌তে পারি না—

এই মাতৃসম্বোধনে ম্রিয়মাণ নন্দরাণীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কুঞ্জ এই সূত্রে বলিয়া উঠিল—নিশ্চয়ই, উনি ত' ঠিকই বলেছেন, ও সব ভার আমার, আমি ও কাজ ভালোই জানি। আমি বলি কি টাকার কথা উপস্থিত চেপে যাওয়াটাই ভালো, একটু আগে যা ঠিক হয়েছিল সেই ভাবে ওদের সব কথা খুলে বলা হোক্, তার পর ধীরে সুস্থে এক সময় টাকার কথা তোলা যাবে, তার জন্যে আর তাড়া কি? কি বলেন অলক বাবু?

এই বুদ্ধিতরঙ্গে কুঞ্জ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়িল, কিন্তু অলক তৎক্ষণাৎ তাহার সকল উত্তেজনা ঠাণ্ডা করিয়া কহিল—তাতে বিপদ বড় কম হবে না, আমি ত' আর জানতুম না আপনারা কিছু বলেছেন কি না, আর আমি আপনাদের চমকে দেবার জন্যেও আসিনি, কেন আমি এত রাত্তিরে এখানে ছুটে এসেছি জানেন—খবরের কাগজের লোকেরা এ সব ব্যাপার জান্‌বার জন্যে রাশি রাশি টাকা খরচা করবে, বড় বড় লোকের

উইল সাধারণের সম্পত্তি, যদি কোন রকমে উইলের খবর বেরিয়ে পড়ে তা'হলে কাল সকালেই আপনার বাড়ীতে দু'শো লোক ছুটে আসবে, টাকার কথা, জহরের কথা, লোকনাথ বাবুর গোপন রহস্য এই সব ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তারা মস্ত গল্প তৈরী করে ফেল্‌বে, সেইটা যথাসম্ভব চাপা দেবার জন্যেই আমার এতদূরে আসা।

নন্দরাণী বলিল—তাহ'লে কি এখনই সব বলা উচিত হবে ?

অলক বলিল—সেই সবচেয়ে ভালো হবে, অন্যের মারফত এসব খবর জানার চেয়ে আপনাদের কাছে শোনাই ত' ভালো—

এতক্ষণে নন্দরাণী বুঝিযাছে অলক তাহাদের শত্রুতা করিতে আসে নাই, এ সংসারের সে পরমাত্মীয—নন্দরাণী ধীরে ধীরে দরজার কাছে গিযা ডাকিল—জহর, সুবর্ণ, একবার নীচে এসো শীগ্‌গির, উনি ডাক্‌ছেন—।

দরজার কাছ হইতে ফিরিযা নন্দরাণী নিঃশব্দে স্বামীর পাশে আসিযা দাঁড়াইল। সিঁড়িতে পদধ্বনি শুনিযা স্বামীর মুখের দিকে চাহিযা সে মৃদুকণ্ঠে কহিল—তা'হলে তুমিই সব কথা গুছিয়ে বলো, আগে থেকেই টাকার কথা তুলে আর কাজ নেই—

তাহাকে ইঙ্গিতে চুপ করিতে বলিযা কুঞ্জ তৎক্ষণাৎ বলিযা ওঠে—সে তুমি ভেবো না, আমি সে সব কাযদা করে বলব'খন। তারপর সহসা তাহার মনে এক শঙ্কাজনক সম্ভাবনার কথা উদয হয, সিঁড়ির পদধ্বনির দিকে কাণ পাতিযা সে চুপি চুপি অলককে প্রশ্ন করিল—এমনও ত' হতে পারে অলকবাবু, ছেলেরা রেগে লোকনাথ বাবু পাগল ছিলেন এ কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে, তারপর আমাদের নামেই একটা মামলা রুজু করে দিতে কতক্ষণ ?

এ প্রশ্নে অলক হাসিল মাত্র। ঠিক এই মুহূর্তে এ ঘরে তাহার উপস্থিতি যে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয এ কথা সে বুঝিতে পারে, তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বাহিরে যাইতে পারিল না। এই পরিবারটির উপর তাহার গভীর

সহানুভূতি জাগ্রত হইয়াছে, তাই এই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে সে তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অপ্রিয় সত্যভাষণ শুনিয়া জহর ও সুবর্ণের মনে তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবার দুর্দ্দমনীয় লোভ সে কিছুতেই জয় করিতে পারিল না। এই কারণেই ব্যক্তিগত কৌতূহল প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সেইখানেই দৃঢ়ভাবে বসিয়া রহিল। কুঞ্জকে প্রবোধ দিয়া সে নীচু গলায় বলিল—মাম্‌লা করবার চেষ্টা হয়ত' একটা হবে, কিন্তু সে মামলা দাঁড়াবার কোন উপায় নেই।

সেই মুহূর্ত্তেই জহর ও সুবর্ণ বেগে ঘরে ঢুকিয়া প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—কি হয়েছে মা, তোমার সব তাতেই তাড়া—তারপর ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া চুপ করিয়া গেল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অলক হয়ত' প্রকৃতি বিশ্লেষণের একটা চেষ্টা করে, সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কষ্টসহিষ্ণু ছেলে মেয়ে, কোথাও আভিজাত্যের একবিন্দু চিহ্নমাত্র নাই, কে বলিবে ইহাদের পশ্চাতে গৌরবময় বংশমর্য্যাদার পটভূমি বর্ত্তমান। সুবর্ণকে আর একবার ভালো করিয়া দেখিতে গিয়া অলক বিশেষ বিস্মিত হইয়া পড়িল, যেন অপটু শিল্পীর হাতে আঁকা বিখ্যাত শিল্পীর ছবির নকল। দেহে কি লাবণ্য—শরীরে কি দীপ্তি!

ঘরের মধ্যে এই বিশ্রী স্তব্ধ আবহাওয়ার আভাস পাইয়া জহর অবাক হইয়া গেল, সে বুঝিল কোথায় একটা অশুভ কিছু ঘটিয়াছে, তাই সে ভয়ে ভয়ে বলিল—কি হয়েছে মা? কিছু খারাপ খবর নয়ত'?

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নন্দরাণী কহিল—কি যে ভালো আর কি যে খারাপ জানি না বাবা, উনি সব বুঝিয়ে বল্‌বেন, কথাগুলো তোমাদের শোনা দরকার। তবে এটা মনে রেখো জহর যে আমরা যেটুকু করেছি তা তোমাদের ভালোর জন্যেই করেছি।

সকলের মুখের দিকে চাহিয়া সুবর্ণ যেন এক জটিল সমস্যায় পড়িয়া

গেল, সে কহিল—ব্যাপার কি ? ইনিই বা কেন এসেছেন, কিছুই ত' বুঝতে পারছি না বাবা ?

কুঞ্জ আগ্রহভরে জবাব দেয়, ইনি একজন পাকা উকীল, মানে ঐ যে কি বলে গো এটর্ণি, বেশ বিচক্ষণ লোক, কলকাতা থেকে এসেছেন, —তারপর সহসা সকলের গম্ভীর মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া একটু বিরক্তিভরেই কহিল—হয়েছে কি তোমাদের ? মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে, এত ভাবনারই বা কারণটা কি জানি না বাপু ! খবর ত' সুখবর, এতে খারাপ কোন্ জায়গাটা ? এতগুলো টাকা হাতে এসে গেল, এ যদি না সুসংবাদ হয়, তাহলে কি ! আমরা ত' আর ভিক্ষে চাইতে যাইনি, কি বলেন অলকবাবু ?

সুবর্ণ বিস্মিতকণ্ঠে বলে—টাকা ! কিসের টাকা বাবা ? এত টাকাই বা আমাদের দিলে কে ?

কুঞ্জ তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠে—অতো খোঁজে দরকার কি বাপু ! টাকা পেয়েছ এই যথেষ্ট—

অনুযোগের ভঙ্গীতে নন্দরাণী বলিল—কি যা তা বক্‌ছ ? ছেলে-মানুষ, অত শত ও কি করে জান্‌বে ?

কুঞ্জ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া ওঠে—কতবার ত' তুমি বলেছ' ভগবান যদি টাকা দিতেন, সে কথা এখন বুঝি আর মনে নেই ?

নন্দরাণী নিঃশব্দে আবার কুঞ্জর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু এবার আর কিছু বলিল না, তারপর ছেলেমেয়েদের—বিশেষ করিয়া জহরকে উদ্দেশ করিয়াই কহিল,—আর কোনো কথা নয়, তবে আমরা একটা উইলের দরুণ হঠাৎ অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছি, কিন্তু ওই-ই সব নয় বাবা, আরো কথা আছে। মিছে কথা বলে এসেছি এতদিন, আমরা তোমাদের সত্যিকার বাপ-মা নই—

—সে আবার কি ! এ তুমি কি বলছ মা ?

দৃঢ়কণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—না বাবা, তোমার বাবা লোকনাথ বাবু মস্ত বড়লোক ছিলেন। ব্যাঙ্ক, মিল এই সকের মালিক, আজ-ই তিনি মারা গেছেন, তুমি তাঁর অবৈধ সন্তান—

গভীর ঘৃণাভরে জহর কহিল—অ-বৈ-ধ অর্থাৎ illegitimate—

সুবর্ণ অস্ফুট কণ্ঠে কি একটা বলিল, কথাটা তেমন শোনা গেল না।

অলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জহরের মুখের দিকে চাহিযা রহিল। জহরের মুখভাবে আত্মাভিমানের উদ্ধত ছাপ পরিস্ফুট, তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিতে সে শেখে নাই, অলকের এই ধারণা হইল।

নিষ্প্রাণ আহত কণ্ঠে জহব বলিল—জগতসুদ্ধ লোক জানবে যে আমার জন্মেব ঠিক নেই, সমাজে আমার আর মাথা তুলে দাঁড়াবার উপায রইলো না, এরপর বেঁচে আব লাভ কি মা ?

সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইযা আবেদনেব ভঙ্গীতে নন্দবাণী কহিল—জানাজানি তেমন হবে না বাবা, আর তাতেই বা তোমার দোষ কোথায, তুমি আমার সেই জহবই আছো, আমরা ত' তোমায ছাড়ব না।

জহর আবাব গভীর দুঃখভরে পুনরাবৃত্তি করিল—Illegitimate, তারপর আবাব বড়লোক। আর কিছু বলিল না, বোধকরি, বলিবার আর সামর্থ্য ছিল না।

সুবর্ণ কহিল—লোকনাথ বাবুই কি আমাদের টাকা দিযেছেন মা ? কিন্তু কি হয়েছিল, কেনই বা তুমি আমাদের মানুষ করলে ?

—আমাদের তখন বড় অভাব, সব দিন আহার জোটে না। সেই সময়েই জগদীশ বাবু আমাদের দুঃখ দেখে তোমাদের মানুষ কোরতে দিযেছিলেন আর সেই সঙ্গে কিছু টাকারও বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গ উপস্থিত চাপা দিবার জন্য স্বর্ণ বলে—খুব কম টাকা।

জহর ইতিমধ্যে কতকটা আত্মস্থ হইয়া রুক্ষ ভাবে অলককে প্রশ্ন করিল—কিন্তু আপনি কে ? এ ব্যাপারে আপনার সম্পর্কটা কি ?

জহরের উপর অলকের একটু অশ্রদ্ধা হইয়াছে, সেও তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল—সম্পর্ক অনেকখানি। আমি লোকনাথ মজুমদারের এটর্ণি, আমাকেই সব বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে।

—তাহ'লে এ কাহিনীর সবটাই সত্যি ?

—নিশ্চয়ই, তাঁর উইলেই প্রকাশ।

উদ্বিগ্ন নন্দরাণী জহরের মুখের দিকে অসহায় ভঙ্গীতে চাহিয়াছিল, সে যেন ক্রমশঃই দূরে সরিয়া যাইতেছে। তাহাকে কাছে টানিয়া আনিবার জন্য নন্দরাণী আর একবার মরিয়া হইয়া বলিল—সব জড়িয়ে ব্যাপারটা খারাপ নিশ্চয়ই, কিন্তু তার জন্যে এত বিচলিত হলে কি চলে ? আমাদের উপর তুমি অসন্তুষ্ট হয়ো না বাবা, আমাদের কি অপরাধ ? আমরা তোমাকে না নিলে অন্য কেউ নিশ্চয়ই ভার নিত, ছেলে মানুষ করা যে কি, কত কষ্টে যে তোমাদের মানুষ করেছি, তা' তোমরা জানো। এক দিনের জন্যেও পর মনে করিনি—এই পর্য্যন্ত বলিয়া নন্দরাণী বোধ করি ভাবাবেগ দমন করিবার জন্য আঁচলে মুখ ঢাকিল।

জহর নন্দরাণীর দিকে চাহিল না। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, অফিসে, পার্টিতে, সমাজে, বন্ধু-মহলে কোথাও আর আমার মুখ দেখাবার উপায় রইল না—

কুঞ্জ তাহাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিল—আর তোমাকে ত' চাকরী কর্‌তে হবে না জহর, এখন আর তোমার অভাব কি ?

—তা' হলেও একদিকে জন্মের পরিচয়, আর একধারে কাঞ্চন-কৌলিন্য, এ যে দাঁড়িপাল্লায় ফেলা যায় না—তারপর বড়লোক, ক্যাপিটালিষ্ট, ছিঃ ছিঃ—

অলক গম্ভীর গলায় কহিল—হ'লেই বা বড়লোক, তিনি ত' দেশের

সেবায় অনেক কিছুই করেছেন, অনেক টাকা দান করেছেন, সে ত' সকলেই জানে—

জহর ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল—বড়লোক আমাদের শত্রু।

জহরের এই উক্তি অলকের কাছে নিছক ছেলেমানুষী বলিয়াই মনে হইল, সে নিজের মনোভাব চাপিযা শুধু বলিল—তাই নাকি!

সুবর্ণ অলকের মুখের দিকে চাহিযাছিল, তারপর জহর ও নন্দরাণীর মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিল। নিজস্ব বোধশক্তি অনুসারে এই ভযঙ্কর সংবাদে তাহারও মন আচ্ছন্ন হইযাছে, তথাপি জহরের আচরণ সে সমর্থন করিতে পারিল না। একটু শ্লেষের সহিত সে বলিল—মার কথা ত' তুমি কিছু জিজ্ঞেস কর্‌লে না দাদা?

এই প্রশ্নে জহর যেন ক্ষেপিযা গেল। উদ্ধত কণ্ঠে সে কহিল—কি দরকার তার? যা জেনেছি, তাই কি যথেষ্ট নয? উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রহীন স্ত্রীলোক, নাম নেই ধাম নেই, নিজের ছেলেকে মানুষ করবার পর্য্যন্ত দাযিত্ব যে নেয নি, কি দরকার তার খবরে? সে খবর জেনে কি আমরা চতুর্ভুজ হবে?

নন্দরাণী আবার শান্ত কণ্ঠে বলিল—ছিঃ, জহর, ও-কথা বলতে নেই। তিনি প্রসব করেই মারা গিছ্‌লেন। তার পব আবার আবেদনের ভঙ্গীতে বলে, আমাদের উপর কি রাগ করেছিস্‌ বাবা! আমাদের—

জহব নন্দরাণীর দিকে একবার চাহিল, তাবপর চীৎকার করিয়া বলিযা উঠিল—অত শত আমি জানি না, যত সব স্ক্যাণ্ডালাস্‌ কাণ্ড—এইটুকু বলিযা সে জানালার পাশে গিযা দাঁড়াইল।

নন্দরাণী বলিল—ছুটো মাকে না খেয়ে তুই ঠাণ্ডা হবি না জহর—তাহার কথায় প্রাণ নাই, হতাশায সারা দেহ-মন ভরিয়া গিযাছে।

এমন সময় একটা বিশ্রী গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল। পাশেই রান্নাঘর, নন্দরাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বান্নাঘরের দরজা খুলিতেই দেখা গেল,

ধোঁয়ায় সেই ছোট ঘরখানি ভরিয়া গিয়াছে। দুধ ঘন করিবার জন্ত অল্প আঁচে উনানে বসান ছিল, তাহাই পুড়িয়া গিয়াছে। নন্দরাণী প্রায় কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—আহা, সমস্ত দুধটাই পুড়ে গেছে, ছেলেদের কি দেব কে জানে—

কুঞ্জ কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়াছিল। এই সামান্ত কথায় জহরের আর রাগের সীমা রহিল না। সে অলককে লক্ষ্য করিয়াই বলিল—দেখুন দিকিনি আক্কেলটা! এই কি দুধ পুড়ে গেছে বলে চেঁচাবার সময়? ভালো জ্বালাতনেই পড়েছি—

সুবর্ণ নিঃশব্দে মাকে সাহায্য করিতে উঠিয়া গেল।

ঘরে ফিরিবার সময় শোনা গেল সুবর্ণ নন্দরাণীকে আন্তরিক ভালোবাসার সুরেই বলিতেছে—তুমি আমাদের মানুষ করে ত' ভালোই করেছ মা, এতে তোমার দোষ হবে কেন? তুমিই ত' মা!

নন্দরাণী সস্নেহে সুবর্ণর মাথায় হাত দিল, কিন্তু নন্দরাণী এ কথা জহরের কাছ হইতেই শুনিবার আশা করিয়াছিল, সে দুঃখ তাহার গেল না।

মায়ের পাশে বসিয়া সুবর্ণ কহিল—কিন্তু কেন যে তুমি এ কাজ করলে মা, তা আমি কিছুতেই ভেবে পাই না, কি তুমি বুঝেছিলে জানি না।

নন্দরাণী দেখিল জহর তখনও জানালার ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তারপর সুবর্ণকে সহজ কণ্ঠেই বলিল—আমরা যে বড় গরীব ছিলুম সুবী, অভাবে স্বভাব নষ্ট, পয়সা না থাকলে অনেক কিছুই লোকে করে যা অভাব না থাকলে কেউ করতো না।

সুবর্ণ তবু ছাড়িবে না, সে প্রশ্ন করিল—তুমি ত' বরাবরই নিজের হাতেই সব কাজ চালিয়ে এসেছ, বাবারও কাজকর্ম করা উচিত ছিল—

নন্দরাণী বলিল—তোমার বাবা ভালো জায়গাতেই কাজ করতেন,

একবার একটা গোলমাল হতে চাকরী গেল, আর চাকরী পাওয়া গেল না—

সুবর্ণ কহিল—চাকরী আর হোল না, সে কি ?

ছেলেমেয়েদের কাছে নন্দরাণী চিরদিন কুঞ্জকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, আজিকার এই অশান্ত আবহাওয়ায় সে আর সত্য কথা চাপিতে পারিল না, বলিল, চারদিকে ওঁর বদনাম রটে গেল, তাঁরা বড়লোক, সবাই বল্লে উনি নাকি মাতাল হয়েছিলেন।

সুবর্ণ সবিস্ময়ে কহিল—বাবা !

কুঞ্জ ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—ঠিক তা নয়। আমার ওপর তাঁদের আক্রোশ ছিল, আসলে ব্রেক ভাল ছিল না।

কুঞ্জ ও নন্দরাণীকে সাহায্য করিবার জন্য অলক উন্মুখ হইয়া বসিয়াছিল, সে কথা কহিবে এমন সময় জহর মুখ ফিরাইয়া সেই রকম আহত কণ্ঠে কহিল—টাকার কথা না উঠ্‌লে এসব বেমালুম চেপে যেতে নিশ্চয়ই !

সুবর্ণ চীৎকার করিয়া কহিল—তুমি চুপ করো দাদা !

নিজের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই চমকাইয়া উঠিল, তাহার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের সহিত ইহার একবিন্দু যোগ নাই, সে আরো বিস্মিত হইল যে তাহার কথায় জহর সত্যই চুপ করিয়া গেল। জহর আবার তেমনই ভাবে জানলার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে সুবর্ণর মনে একটা নূতন প্রশ্নের উদয় হইল, সে বলিল—আমি ত' দাদার চেয়ে ছোট, যদি দাদার মা প্রসব করেই মারা গিয়ে থাকেন—

নন্দরাণী তৎক্ষণাৎ বলিল—লোকনাথ বাবুর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার মাকে আমি জানি, তিনিও বড়লোকের মেয়ে—

সুবর্ণর মুখখানি লজ্জায় গভীর ভাবে রাঙা হইয়া গেল—সে ধরা গলায় বলিল—আমার বাবা ?

—সে কথা আমরা জানি না।

—আমার মাও কি নেই ?

—আছেন বৈকি, মস্ত ব্যারিষ্টারের স্ত্রী। অলক এ প্রশ্নের জবাব দিল।

সুবর্ণ সকলের মুখের দিকে একবার করিয়া তাকাইল, তাহার সুন্দর মুখখানি লজ্জায়, অপমানে রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার গৌরবর্ণ মুখখানিতে সেই হৈমন্তী সন্ধ্যায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে। এতকাল নন্দরাণীর আদর্শে সে তাহার সামাজিক সম্ভ্রমের মাপকাঠি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, এখন এই মুহূর্ত্তেই সব পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া বড় সহজসাধ্য নয়, এমন কি এতক্ষণে জহরের উপর তাহার সহানুভূতি সঞ্চারিত হইল।

সে ধীরভাবে বলিল—তুমি যেন একটা অনাথ-আশ্রম খুলেছিলে মা। তারপর নন্দরাণীর বেদনাক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, কি জানো মা—হঠাৎ যেন সব ওলোট-পালট হয়ে গেছে, কোথায় যে দাঁড়িয়ে আছি জানি না—!

নন্দরাণী আবার আঁচলে মুখ লুকাইল, অলক বসিয়া বসিয়া নন্দরাণীর সংসার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল, এ-সংসারের যোগসূত্র কি ইহার পরও অবিচ্ছিন্ন থাকিবে, নন্দরাণীর সংসারটি তাহার কাছে বিদেশীর চোখে ভারতবর্ষের মতো মনে হইতে লাগিল, এতগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বী, বিভিন্ন চরিত্রকে লইয়া কিসের আকর্ষণে নন্দরাণী ঘর বাঁধিবে! কি করিয়া ইহাদের মিলনের গ্রন্থি অটুট থাকিবে, ইহা সে ভাবিয়া পায় না। ব্যক্তিগত ভাবে তাহারও একটু চেষ্টা করা উচিত মনে করিয়া অলক ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—আপনাদের ওপর যদি কোনো অবিচার হয়ে থাকে তার জন্যে এঁরা—যাঁরা মানুষ করেছেন তাঁদের কোনো দায়িত্বই নেই, কোনো অপরাধ নেই। লোকনাথ বাবুর সংসারে শান্তি ছিল না, তারপর যৌবনে মানুষের একটু আধটু পদস্খলন হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। যখন জহর বাবুর মা মারা গেলেন,

তখন তিনি সত্যই কষ্ট পেয়েছেন এবং বিশেষ ব্যাকুল হয়ে আপনাকে মানুষ কর্‌বার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি নিজে গরীবের ঘরের ছেলে, তাই গরীবের ঘরে যাতে আপনার বাল্যজীবন গড়ে ওঠে সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার বাবা তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে এখানে আপনাকে রেখেছিলেন, যতদিন বেঁচেছিলেন আপনার সম্পর্কে সব খবরই নিয়েছেন, এদিকে এঁদের সংসারেও তখন বিশেষ অভাব, কাজেই এঁরাও আগ্রহভরে আপনাকে গ্রহণ করেছিলেন, এতে কোথায় এঁদের অপরাধ, কোথায় যে ত্রুটী তা' ত' আমি ভেবে পাই না—

জহর হয়ত' কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সেই সময় সুবর্ণ বলিয়া উঠিল—আমি ?

অলক বলিল—আপনার কথা আলাদা, সে সময়ে আপনার মার বয়স ছিল খুবই কম, আপনার দাদামশায়ের সমাজে দারুণ সুনাম, তাই তাড়াতাড়ি সব কথা চাপা দেওয়া হয়েছিল।

সুবর্ণ শ্লেষভরে কহিল—আপনাদের অফিসে বুঝি এই রকমের কাজই বেশী ?

অলক মৃদু হাসিয়া কহিল—বেশী না হলেও মাঝে মাঝে দু'একটা করতে হয় বৈকি।

এবার সুবর্ণ দুর্ব্বলকণ্ঠে কহিল—আমার মা কি আপনাদের কাছে কখনও খবর নেন ?

অলক একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—তিনি একটু আপন-ভোলা মানুষ।

সুবর্ণ সহসা সচেতন হইয়া কহিল—কিন্তু অনীতা ? তার সম্বন্ধে ত' কিছু বল্‌লেন না ?

নন্দরাণী শান্তকণ্ঠে কহিল—অনী আমার আপন মেয়ে।

—সত্যি! মানে সত্যিকার মেয়ে?

—হ্যাঁ, কোনো আশাই ছিল না, তারপর অনেক বয়সে অনীতা হোল।

সুবর্ণ বলিল—তোমার কোনো দোষ নেই, নিজের মা আর তোমাতে তফাৎ কোথায়?

কিছুক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না, স্তব্ধতার ঘোরটুকু কাটিবার পর কুঞ্জ বলিল—তাহলে এবার টাকার সম্বন্ধে—

এমন সময় সদর দরজায় ভীষণ জোরে কড়া নড়িয়া উঠিল,—আওয়াজ আর থামিতে চায় না, বাহিরে অনীতার গলা শোনা গেল, এতক্ষণে অনীতা আসিয়া পৌঁছিয়াছে—

নন্দরাণীর ম্লান মুখখানি ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

৭

অনীতার আবির্ভাবে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এক মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যে-ঘরখানি এতক্ষণ সশঙ্ক স্তব্ধতায় মূহ্যমান হইয়াছিল, অনীতার এই উচ্চকিত উপস্থিতিতে তাহা যেন চঞ্চলতায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।

অনীতার বয়স আঠার কিংবা উনিশ হইবে, কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া একটা প্রখর উজ্জ্বল দীপ্তি প্রবহমান, শুধু রূপ নয় দেহের এই কমনীয়তাই তাহাকে পরম লাবণ্যবতী করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কাছেও তার প্রভেদ অনেকখানি, এই বয়সে তাহার মতো রূপ ও সৌন্দর্য্যের খ্যাতি কাহারও ছিল না, প্রাণের প্রাচুর্য্যে অনীতা প্রগলভ, জহর বা সুবর্ণ কোনো দিন এতখানি উচ্ছল হইয়া উঠে

নাই। পরিপূর্ণ যৌবন তাহার সারা দেহে একটা উচ্ছৃঙ্খল মাদকতা আনিয়াছে।

বাহির হইতেই অনীতার কলরব শোনা যাইতেছিল, এখন দরজার ধারে আসিয়া একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে থামিয়া অনীতা নিজের আবির্ভাব বার্ত্তা ঘোষণা করিল—হ্যালো এভ্রিবডি, হিয়ার আই এ্যাম্—

সহসা দেখিলে মনে হইবে ফিল্ম হইতে কিছু অংশ কাটিয়া আনিয়া পর্দ্দায় প্রতিফলিত করা হইয়াছে।

অনীতার এই নাটকীয় আবির্ভাব সকলেই নিস্পৃহভাবে লক্ষ্য করিল, কেহই একটিও কথা কহিল না। অনীতা সোজাসুজি কুঞ্জর পাশে গিয়া দাঁড়াইল, কহিল—

তোমার বুঝি রাগ হয়েছে বাবা?

কুঞ্জ এ কথার কোন জবাব দিল না, অনীতা পর্য্যায়ক্রমে জহর ও সুবর্ণর মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্রান্ত ভঙ্গীতে জননী নন্দরাণীর পাশে বসিয়া পড়িল, তারপর কহিল—এমন রাগ ত' কখনো দেখিনি, একটু দেরী হয়েছে বলে সবাই অম্নি মুখ ভার করে বসে রইলে,—

নন্দরাণী গভীর আবেগে অনীতাকে বুকে টানিয়া লইল, এতখানি নিবিড় ভাবে বোধ করি সে কোনোদিন তাহাকে কাছে টানিয়া লয় নাই। আজ নন্দরাণী বুঝিয়াছে ইহাই তাহার একমাত্র সম্বল। এই ভাবাবেগের ভিতর কিন্তু নন্দরাণী কর্ত্তব্যজ্ঞান হারায় নাই, তাই অনীতাকে ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এত দেরী করে? আমরা এদিকে ভেবে মরি!

অনীতা বলিল—তোমরা যদি মিছিমিছি ভাবো! আমি ত' আর ছোট্টটি নেই, পথ চিনে আসতে পারি না?

—কেন যে ভাবি সে তুমি বুঝবে না মা—

অনীতা জবাবদিহি করিতে ভালবাসে না, কতকটা অভিমান ভরেই সংক্ষেপে বলিল—কি করবো বলো, ষ্টেশনে এসে দেখা গেল রেণুদি'র

স্যুট্‌কেস্ নেই, চারদিক খোঁজা হোল, এদিকে ট্রেণ ছেড়ে দিলে, তারপর রেণুদি'র বাসায় গিয়ে শেষে দেখা গেল, যেখানকার স্যুট্‌কেস্ সেখানেই পড়ে আছে। কাজেই দেরী হোল, এদিকে তোমরা আকাশ-পাতাল ভেবেই সারা—

নন্দরাণী আর কিছু বলিল না। এতক্ষণে অলককে লক্ষ্য করিয়া প্রগল্‌ভ ভঙ্গীতে অনীতা বলিল—ছি ছি, আমি আগে দেখিনি, আপনি বুঝি দাদার বন্ধু? নমস্কার!

অলক প্রতি-নমস্কার জানাইয়া মৃদু হাসিল মাত্র।

অনীতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে, তাহার মুখে তাই সহসা কোনো কথা ফুটিল না।

অলকের এই কুণ্ঠিত ভাব অনীতার কাছে বিসদৃশ ঠেকিল, এতক্ষণ সকলেরই মুখে একটা সংশয়কুণ্ঠ ভাব লক্ষ্য করিয়া সে ঘরের ভিতরকার বিস্ময়কর সংযত আবহাওয়া সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিল, তারপর বিস্ময়-বিমিশ্র কণ্ঠে কহিল—কি ব্যাপার বলো ত'! সবাই চুপ করে বসে আছ—যেন একটা ভয়ঙ্কর এ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটে গেছে—

জহর শুষ্ক কণ্ঠে কহিল—এ্যাক্‌সিডেণ্টই বটে, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্ঘটনা—

কুঞ্জ আর থাকিতে পারিল না, বলিল—দুর্ঘটনা! এর নাম দুর্ঘটনা, কি হয়েছে আমিই বল্‌ছি শোন, এখন জানা গেল আমাদের হাতে হঠাৎ কিছু টাকা এসে পড়েছে—

জহর পুনরাবৃত্তি করিল, সেই ত' দুর্ঘটনা, যদি টাকা না আসত, তাহলে হয়ত এ কলঙ্ক-কাহিনী আমাদের শুন্‌তে হোত না, এতখানি ঠক্‌তে হোত না, আপনি শুধু টাকাটাই বড় করে দেখছেন—

অনীতা কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে নন্দরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নন্দরাণীকেই হয়ত আবার গোড়া হইতে

সুরু করিতে হইত, কিন্তু তাহার পরিশ্রান্ত মুখখানি সুবর্ণর অন্তরে করুণার উদ্রেক করিল। সুবর্ণ তাই শান্তকণ্ঠে কহিল, আমিই বল্‌ছি অনী। ব্যাপারটা হয়ত সত্যিই তেমন গুরুতর নয়, আবার মন থেকে উড়িয়ে দিতেও পারি না, এতকাল আমরা যা জেনে এসেছি তা ভুল, কাজেই এটা একটা নিদারুণ শক্‌ বলে মনে হচ্ছে, তবে সবই সয়ে যাবে, সময়ে সবই সয়। এখন জানা গেল লোকনাথ মজুমদার আমাদের অনেক টাকা উইল করে দিয়েছেন, দাদা নাকি তাঁরই ছেলে।

অনীতার বিস্ময়ের ঘোর আর কাটে না, সে কহিল—কি বল্‌ছ দিদিমণি! তোমার সবতাতেই ঠাট্টা।

সুবর্ণ শান্ত সংযত কণ্ঠে কহিল—ঠাট্টা নয় অনী, এই সত্যি, বাবা মা আমাদের শুধু মানুষ করেছেন, আমরা—

সুবর্ণর গলার স্বর আবেগে অবরুদ্ধ হইয়া গেল, তাহারা যে কি ও কে তাহা সে কিছুতেই নিজের মুখে প্রকাশ করিতে পারিল না, তাহার সৌম্য মুখখানিতে একটা কঠিন বেদনানুভূতির ছাপ নিবিড় হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া সুবর্ণ কহিল—আমরা নাকি বড়লোকের ঘরের ছেলে মেয়ে, অথচ আমাদের কোনো সামাজিক পাসপোর্ট নেই—

অনীতা বলিল—ছিঃ দিদিমণি, তোমার বুঝি রাগ হয়েছে?

সুবর্ণর ম্লান মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বলিল—রাগ কার ওপর কর্‌বো অনী, এই যে সত্যি, সাম্‌নেই তোর এটর্ণী বসে রয়েছেন। উনিই ত' উইলের খবর নিয়ে এলেন—

বিস্ময়বিমূঢ় চোখে অনীতা অলককে আর একবার ভালো করিয়া দেখিল, বলিল, আপনি তাহ'লে এটর্ণী বুঝি, আমি মনে করেছিলুম দাদার বন্ধু। কিন্তু আপনি কি করে জান্‌লেন এত খবর?

অলক বলিল—জানাই ত' আমাদের ব্যবসা, আমরা লোকনাথ বাবুর এটর্ণী, জহর বাবু তাঁরই ছেলে—

এতকাল জহরকে বড় ভাই বলিয়া অনীতা মান্ত করিয়াছে, ভয় করিয়াছে, তাহার বলিষ্ঠ স্পর্শের আশ্রয়ে দুঃখের দিনে মুখ লুকাইয়াছে, আজিকার এই গ্লানিকর মুহূর্ত্তে ঐ মানুষটির অন্তরে যে একটা নিদারুণ সংঘর্ষ চলিতেছে লঘুচিত্ত হইলেও অনীতা তাহা অনুভব করিল। হয়ত দাদাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যেই অনীতা জহরের পাশে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

অনীতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অর্থহীন শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া জহর বলিল, আমাদের আর মুখ তুলে দাঁড়াবার উপায় নেই অনী, আমাদের এখন পথের লোকও লাঞ্ছনা করবে, এমনই অদৃষ্ট—

অনীতা কহিল—তুমিও অদৃষ্ট মানো দাদা ?

—মানতুম না, এখন মানি, না হ'লে লোকনাথ মজুমদারই বা আমার কে— কেনই বা তিনি আমাদের নামে টাকা দেবেন বলো ? যে ভাবে মানুষ হয়েছি, যে সংসারের পরিচয়ে পরিচিত, সেই ত' আমার সম্মান, সেই ত' আমার মর্য্যাদা, কি ক্ষতি হ'ত এই খবরটুকু না পেলে, কি লাভ হোল এই টাকার থলি হাতে এসে। এ যদি মেনে নিতে হয় তাহলে অদৃষ্টকে ত' আর এড়িয়ে চলতে পারবো না !

সুবর্ণ বলিল—একটু ঠাণ্ডা হও দাদা, মিছামিছি ভেবে কি লাভ ?

জহর বলিল—ভাববার আর ক্ষমতা নেই সুবী, ভাবনার শেষ নেই, এখনও যে সারা জীবনটাই বাকী !

সুবর্ণ বলিল—তবু তুমি পুরুষ, সমাজে তোমার অবাধ গতি, আমার কথাটা ভেবেছ ?

অনীতা বলিল—তোমার আবার কথা কি ? আমাদের যে-পথ তোমারও সেই পথ—

নীরস হাস্যে সুবর্ণ কহিল—লেখাপড়া শিখলেও আমরা মেয়ে, এটা [illegible] অনী, আমাদের বাধা পদে পদে—

অনীতার মাথায় এতো সব বড় বড় কথায় স্থান নাই, সে বলিয়া বসিল, —তোমরা না হয় লোকনাথ বাবুর ছেলে-মেয়ে, আর আমি?

সুবর্ণ বলিল—তোমার আর কি? তোমার গায়ে কলঙ্কের আঁচড়টুকুও নেই, তুমি এঁদেরই—

অনীতা ঠিক এ উত্তরের আশা করে নাই, তাহার মুখে চোখে একটা গভীর নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিল,—তাহার চোখের সে উজ্জ্বল দীপ্তি যেন এক নিমেষেই অন্তর্হিত হইল, সুবর্ণ ও অলক অনীতার এই হতাশ মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিল। অনীতা চিরদিনই একটু রোমান্স-ব্যাকুল, তাহার নিজের সম্বন্ধে কিছু শুনিবার জন্য সে উৎসুক হইয়াছিল। সুবর্ণ এবং জহরের চেয়েও রোমাঞ্চকর আবেষ্টন সে আশা করিয়াছিল।

সুবর্ণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল—অনীতা, দাদার কথা শুনলে? আমিও নাকি এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, কিন্তু তোমার মর্য্যাদার কাছাকাছিও যে আমরা নেই, এ কথা ভেবেছ?

অনীতা তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া কহিল—কিন্তু দিদিমণি, আমি ভাবছি এ যেন রূপকথা! এ যে বিশ্বাসের বাইরে! এর ওপর আবার টাকা, এত কথা ভাবতেও পারি না—

জহর বলিল—উইলে টাকাটা বাবার নামে দেওয়া হয়েছে—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুবর্ণ বলিয়া ফেলিল—আমাদের মানুষ করার পুরস্কার।

আহত কণ্ঠে নন্দরাণী বলিল—আমাদের কি অপরাধ, টাকার লোভেই তোমাদের নিয়েছিলুম বটে, কিন্তু পুরস্কারের আশা রাখিনি—

যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত সুবর্ণ বলিল—তোমার দোষ কি মা! তুমি না থাকলে আমরা কোথায় দাঁড়াতুম আজ, বাপ-মা যাদের স্বচ্ছন্দে দূর করে দিয়েছেন, কোনো দায়িত্বই নিতে পারেন নি, তুমি তাদের নিজের ছেলে-মেয়ের মতোই মানুষ করেছ, টাকায় কি সে ঋণ শোধ হয়?

ভাগ্য-বিড়ম্বিতা সুবর্ণর এই আকুলতায় জহরের মনের জ্বালা হয়ত কিছু

হ্রাস পাইল, সে এতক্ষণে কহিল—তুমি কেন মিছে চোখের জল ফেল্‌ছ মা, দোষ আমাদের অদৃষ্টের—

বোধকরি এই অস্বাচ্ছন্দ্যকর আলোচনা শেষ করিবার উদ্দেশ্যেই সুবর্ণ পরিহাসভরে কহিল—অতবড় সোস্যালিষ্ট ছেলে তোমার যে রাতারাতি এতবড় ফেটালিষ্ট হয়ে উঠবে—তাই বা কে জান্‌ত!

এ কথায় জহরও হাসিয়া ফেলিল।

রিষ্টওয়াচের দিকে লক্ষ্য পড়িতেই অলক উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—আজ আমি উঠি, দু' এক দিনের মধ্যেই—

অলকের কথায় বাধা দিয়া নন্দরাণী কহিল—এত রাতে ত' আর ট্রেণ ধরতে পারবে না বাবা, আজকের রাতটা কষ্ট করে তোমাকে এখানেই কাটাতে হবে—

কুঞ্জ পরম উৎসাহভরে বলিল—নিশ্চয়ই, এত রাতে আপনার যাওয়া হতেই পারে না,—

যে এতবড় সৌভাগ্যের বাণী বহন করিয়া আনিযাছে তাহাকে সে আজ আর ছাড়িতে চায না।

নন্দরাণী বলিল—সারা বছর ধরে এই দিনটির আশায আছি, ছেলেরা আসবে, এক মাস ধরে তারই আয়োজন চলেছে, আজকের দিনে ভগবান আমায তেমনি কষ্ট দিলেন—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নন্দরাণী আর কিছুতেই উদ্‌গত অশ্রু চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

ব্যথা ও বেদনার সংঘাতে অন্তরে আর্ত্তনাদ করিলেও সুবর্ণ পরম আগ্রহভরে নন্দরাণীর হাত ধরিয়া বলিল—চলো মা, অনেক রাত হয়েছে, দু'জনে মিলে চট্‌পট্ খাবার দেবার বন্দোবস্ত করে ফেলি, অনী আসন-গুলো তাড়াতাড়ি সাজিয়ে দে না ভাই—

সে রাত্রে অলক আর কলিকাতায় ফিরিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে দু'টি সুবর্ণর ঘুম ভাঙিল। সুবর্ণর মনে হইল সে আর নিঃসঙ্গ নয়, সহসা যেন দু'টি সুবর্ণর অভ্যুদয় হইয়াছে। গত রজনীর ঘটনাবলী তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাই সেই কথাই বারবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

নূতন সুবর্ণ মাথার বালিশটি বুকের নীচে চাপিয়া শূন্যদৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে চাহিয়া একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, বালিশটি আরো নরম, বিছানা অধিকতর কোমল হইলেই হয়ত ভালো হইত, চাদরের শুভ্রতা সেই প্রায়ান্ধকার প্রভাতে সুবর্ণর চোখে মলিন বলিয়া মনে হইল। প্রাক্তন সুবর্ণ কিন্তু এই মনোভাবে বিরক্ত হইল, ঘড়ির কাঁটার গতি লক্ষ্য করিয়া সে তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, এই প্রভাতে বিছানায় শুইয়া থাকার মতো বিলাসিতাটুকুর অবসর কোথায়! পাশেই অনীতা ঘুমে অচৈতন্য হইয়া আছে, সুবর্ণ তাহার সেই নিদ্রাচ্ছন্ন শিথিল দেহটির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর নিঃশব্দে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

বাড়িতে থাকিলে সেই সর্ব্বপ্রথম উঠিয়া ষ্টোভ্ জ্বালিয়া চা তৈরী করে, তারপর সারা বাড়ির লোককে ডাকিয়া তোলে, ইহাই তাহার চিরদিনের অভ্যাস। আজো তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুবর্ণ দেখিল অলক ইতিমধ্যেই উঠিয়া পড়িয়াছে, সকালের গাড়িতেই কলিকাতায় ফিরিবার জন্য তাহার যাত্রার আয়োজনও সম্পূর্ণ, শুধু কাহাকেও না জানাইয়া সে যাইতে পারিতেছিল না।

সুবর্ণ বলিল, এর মধ্যেই উঠে পড়েছেন ? অচেনা জায়গায় ভালো ঘুম হয়নি ত' ?

অলক হাসিয়া বলিল, ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি একটুও, তবে আমাকে সাড়ে ছ'টার ট্রেণে ফিরতেই হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে, তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়্লুম।

সুবর্ণ বলিল—তা ত' জানি না, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি চট্ করে চা তৈরী করে আনি। মাকে না জানিযে আপনার কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না।

অলক বলিল, আমার একটুও সময় নেই, চা আর একদিন এসে খাব, আজকে আমায ছেড়ে দিন, আমাব কাজের কথা শুন্লে তিনি কিছু বল্বেন না।

ইহার পব সুবর্ণ অলককে আর কিছু বলিল না। নীরবে এই কর্ম্মব্যস্ত মানুষটির যাত্রাপথেব দিকে চাহিয়া রহিল।

.

সুবর্ণ চা তৈরী করিযা জহব ও কুঞ্জকে ডাকিতে গেল, নন্দরাণী ইতিমধ্যেই উঠিয়া পডিযাছে। কুঞ্জর ঘুম অনেক আগেই ভাঙিযাছিল, সুবর্ণকে দেখিয়া সে তখনই উঠিযা পড়িল, সুবর্ণ বলিল—বাবা, চা তৈরী হযেছে, শীগ্গির করে মুখ ধুযে নিতে হবে।

কুঞ্জ বলিল—অলক বাবু উঠেছেন ?

সুবর্ণ বলিল—তিনি ভোরে উঠেই পালিযেছেন, মশার কামড়ে হয়ত সারারাত ঘুমুতে পারেন নি—

কুঞ্জ বলিল—তাই নাকি ! ছি ছি, এত ভোরেই চলে গেলেন !

সুবর্ণ বলিল—না বাবা, তিনি কাজের মানুষ, তাড়াতাড়ি কল্কাতায় ফেরার দরকার তাই, রাগ করে চলে যান্নি। এই টেবিলের ওপর চা রেখে দিলুম, তাড়াতাড়ি না এলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কুঞ্জ বলিল—আমি এখনই আস্‌ছি।

সুবর্ণ জহরের দরজায় ধাক্কা দিয়া ভিতর হইতে কোনো সাড়া পাইল না, সুবর্ণ আবার ডাকিল—দাদা! বেলা হয়েছে, উঠবে না? আমি চা এনেছি—

ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠে জহর বলিল—দরজা খোলা আছে, ভেতরে আয়—

সুবর্ণ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল জহর দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে, সুবর্ণ আসিতে সে ফিরিয়াও দেখিল না।

সুবর্ণ জহরের মনোভাব বুঝিল, তথাপি তাহার মনোভাব কাটাইবার জন্য বলিল—সকালবেলা আমার মুখ দেখ্‌বে না ঠিক করেছ বুঝি? ওঠো, চা এনেছি—

জহর এতক্ষণে পাশ ফিরিল, কহিল, চা খাবো না মনে কর্‌ছি—

সুবর্ণ বলিল—খেলেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, সারারাত জেগে আছ, এককাপ চা খেলে তবু নার্ভগুলো হযত—

জহর বলিল—তুই থাম্, সকালবেলা আর চায়ের বিজ্ঞাপন দিতে হবে না। সত্যি, কিছুই ভাল লাগছে না সুবী।

সুবর্ণ ধরা গলায় বলিল—কাল রাতের মতো আজো চালাবে নাকি? মা'র কথাটা তুমি একটুও ভাবছো না দাদা!

জহর সুবর্ণর হাত হইতে চায়ের পেয়ালাটি লইয়া কহিল, মার কথা বুঝি, তাঁর জন্যে আমার দুঃখও বড় কম নয়, কিন্তু আমার কথাটাও ভাব্‌বার। আমারও ত' একটা মন আছে, কি এমন মহাপাপ করেছি যে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়াবো। মন থেকে যে তা কিছুতেই দূর করতে পারি না। জীবনে বাপ-মা স্বীকার্য্য, আমিও এতকাল বাপ-মাকে স্বীকার করে এসেছি, কিন্তু কালকের ঘটনায় যেন সব ভেঙে চুরে একাকার হয়ে গেছে—

সুবর্ণ বলিল—তবু যাঁরা বহু দিনের শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ না রাখাই ভালো নয় কি? সহজভাবে দেখ্‌লে মনটাও অনেকটা সহজ হয়ে যাবে!

জহর বলিল—কিন্তু এই যে কলঙ্ক, এর কথা তুই ভুলে যাচ্ছিস্ কেন?

সুবর্ণ শূন্যে মাথা দোলাইয়া লঘুভাবে বলিল—আমি কিছুই মনে করি না, আমাদের মতামত ব্যক্তিগত, বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো চিরন্তন নয়। এঁদের ওপর আমার গভীর মমতা আছে, তাই এক নিমেষেই এদের ধ্বংস করে দিতে চাই না। এটা জানি যে আমিও মানুষ মাত্র, অতীতের সার্থকতা কি, বর্ত্তমান যদি সদয় হয়, ভবিষ্যৎ যদি করুণা করে—

জহর সুবর্ণর এই বাক্যতরঙ্গে বিস্মিত হইয়া কহিল, কাল-সমুদ্র কিন্তু কাউকেই করুণা করে না, সে কারও আজ্ঞাবহ নয়, আর এই illegitimacy—?

সুবর্ণ তেমনই লঘুভাবে বলিল, যাকে তুমি প্রাধান্য দেবে সেই মাথায় উঠে বস্‌বে, কাল থেকে ঐ illegitimacy তোমার মাথায় ঢুকেছে, আমার ত' মনে হয় এও একরকম ভালোই, তবু ত' একদিন একজন এতটুকু স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে—

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়াই লজ্জায় সুবর্ণর মুখখানি রাঙা হইয়া গেল, একি বিশ্রী কথা সহসা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল! সুবর্ণ তৎক্ষণাৎ জহরের ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুবর্ণ নিজের ও অনীতার চা লইয়া তাহাদের ঘরে গিয়া দেখিল অনীতা উঠিয়া পড়িয়াছে এবং সেই প্রভাতেই বিছানায় বসিয়া একখানা বিলাতী ফিল্ম্ ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাইতেছে। সুবর্ণকে দেখিয়া বলিল—মর্ণিং টি, হাউ লাভ্‌লী! দিদিমণি, তোমার ডিউটী জ্ঞান অদ্ভুত।

সুবর্ণ ম্লান হাসিয়া বিছানার ওপর বসিয়া পড়িল, তারপর কৃত্রিম অনুযোগের সুরে বলিল, তবু ত' একটা থ্যাঙ্কস্ দিলিনি।

অনীতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল—এ থাউজেণ্ড্ থ্যাঙ্কস্, কিন্তু দিদিমণি কাল সারা রাত আমার একবিন্দুও ঘুম হয়নি, এখনও ভাব্‌ছি সত্যি এত কাণ্ড হয়েছে না এ সব একটা স্বপ্ন!

সুবর্ণ শুধু কহিল—স্বপ্ন নয় সুবর্ণ, তবে দুঃস্বপ্ন বটে!

অনীতা বলিল—তুমি কি করে যে এতখানি শান্ত হয়ে আছো তা আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না, আমার সঙ্গে ত' এ ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই, তবু আমারই যেন মনে হচ্ছে সব টপ্‌সী-টার্‌ভী হবে আছে, আমার ত' মাথায় কিছু আসে না—।

সুবর্ণ বলিল—মিছে ভেবে আর কি করি বলো, অতীতটা ত' আর মুছে ফেল্‌তে পার্‌বো না। চা খেয়ে নাও, এতক্ষণে হয়ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

এমন সময় উভয়েই শুনিল, নন্দরাণী তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। সুবর্ণ বলিল—তাড়াতাড়ি নে অনী, মা কেন ডাক্‌ছে দেখি—

অনীতা বলিল—আমি জানি, আজ ষষ্ঠী। মা নতুন কাপড় জামা দেবার জন্যে ডাক্‌ছে।

সুবর্ণ সহসা সচেতন হইয়া বলিল—ঠিক বলেছিস অনী, আমি কিন্তু একেবারেই ভুলে গিয়েছি, আমরাও মা-বাবার জন্যে কাপড় এনেছি, সে সব তেমনই প্যাক্ করা রয়েছে।

অনীতা বিছানা হইতে উঠিয়া বলিল—কোথায় রেখেছ? সুটকেসে? আমারটা ত' টেবিলেই পড়ে আছে—

সুবর্ণ ও অনীতা পূজার উপহার লইয়া নীচে নামিয়া গেল। নিস্তব্ধ বাড়িখানি ক্ষণকালের জন্য কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল।

শারদীয়া উৎসব এ বাড়িতে নিরানন্দেই কাটিয়া গেল। এ কয়দিন সংবাদপত্রের রিপোর্টার, কৌতূহলী প্রতিবেশী ও নানা জাতীয় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের ভীড়ে বাড়ির পবিত্রতা রক্ষা করা ক্রমশঃই যেন কঠিন হইয়া পড়িতেছে। বাড়ির ভিতর পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কয়েকটি নিঃসঙ্গ মানুষ নিদারুণ শূন্যতায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

নন্দরাণী একদিন কহিল—আর ত' পারি না বাপু, সাতশো লোককে জবাবদিহি করো, কত রকমের প্রশ্ন, কত কথা—

সুবর্ণ বলিল—লোকের চাপা হাসিতে আমার দুঃখটা যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে, এর যেন আর নিস্তার নেই—।

নন্দরাণী সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—অস্থির হোস্‌নি মা, আমি একটা কথা ভাব্‌ছি, কিছু দিন বাইরে কোথাও গিয়ে থাক্‌লে হয় না? এই ধরো পুরী কিংবা কাশী!

সুবর্ণ বলিল—এই ত' আমরা বিদেশেই আছি মা, এ ত' আর আমাদের দেশ নয়।

নন্দরাণী বলিল—এ রকম বাইরে নয়, সত্যিকার বিদেশ, যেখানে গেলে অন্ততঃ এই জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব।

সুবর্ণ বলিল—সে রকম দেশ আবার আছে নাকি?

কৃষ্ণ এই আলোচনা মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিল মাত্র, ইচ্ছা করিয়াই সে তাহার মতামত প্রকাশ করে নাই, এতক্ষণে বলিল—দিল্লী গেলে হয়, সেও ত' বিদেশ।

নন্দরাণী বলিল—হিল্লী-দিল্লী জানি না, একটা ভালো জায়গা হবে—অথচ তেমন দূর নয়। তাহ'লে আমি অলক বাবুকে বলে একটা ব্যবস্থা করতে পারি।

জহর এইবার এ আলোচনায় যোগ দিল। বলিল, পুরীও নয় কাশীও

নয়, একটি মাত্র দেশ আছে যেখানে কেউ কারুর কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না। যার যা খুসী করতে পারো কেউ কিছু বল্‌বে না, কেউ সাহসও কর্‌বে না, যদি যেতে হয় সেখানেই চলো।

সকলেই সমস্বরে বলিল—কোথায় ?

কুঞ্জ রহস্য করিয়া বলিল—কোথায় আবার, লঙ্কায় ?

জহর গম্ভীরভাবে বলিল—না, তার নাম—ক লি কা তা।

৯

দেশী ও সাহেব পাড়ার মধ্যে সমন্বয় রাখিয়া অলক এলগিন রোডে বাড়ি ঠিক করিয়াছিল। অলক যাহা করিয়াছে তাহা যে তাহাদের নবলব্ধ সম্মান ও মর্য্যাদার উপযুক্ত তাহা কুঞ্জ বুঝিয়াছিল, সুতরাং বাড়ি তাহার অপছন্দ হয় নাই। সোফা, টেবিল, টিপয়ে ভারাক্রান্ত এই প্রাসাদটি কিন্তু নন্দরাণীর কাছে তেমন লোভনীয় মনে হয় নাই। এই ধূলি-ধূসরিত সহরের কল-কোলাহলে সহসা যেন তাহারা হারাইয়া গিয়াছে, তথাপি কলিকাতার সভ্য-সমাজে সম্ভ্রম বাঁচাইয়া চলিতে এই সব আড়ম্বরের প্রয়োজন আছে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এই ভাবিয়াই নন্দরাণী কিছু বলিতে সাহস করে নাই। অলক বাবু না থাকিলে কি বলিয়া যে এই ক'দিনেই এত কাণ্ড সম্ভব হইত স্বামী-স্ত্রীতে তাহা ভাবিয়া পায়না।

আর সব সহ্য হইলেও মাসে মাসে প্রায় দুশ' টাকা করিয়া এ বাড়ির ভাড়া দিতে হইবে শুনিয়া অবধি নন্দরাণীর মনে আর শান্তি নাই। এক-একদিন মধ্যরাত্রে সহসা ঘুম ভাঙিলে নিদ্রাহারা নন্দরাণী এই কথা ভাবিয়া শিহরিয়া ওঠে, নিষ্পলক নয়নে ঘরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হয় সর্ব্বনাশ তাহাদের হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

দুঃখ ও দুর্দ্দশার মধ্যে এতকাল কাটাইলেও নন্দরাণী এমন কোন ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া ওঠে নাই, আজ সৌভাগ্যের সপ্তম স্বর্গে উঠিয়া এ কি যন্ত্রণা।

বড়লোক হওয়ার অনেক বিপদ, আগে এত শত নন্দরাণীর জানা ছিল না। দাসী-চাকরের কাজটা বরাবর নন্দরাণী নিজেই চালাইয়া আসিয়াছে, কলিকাতায় আসিবার পর ঠাকুর, চাকর, বেয়ারায় একে একে বাড়ি ভরিয়া গেল। বড়লোকের বাড়িতে ইহারাও অপরিহার্য্য।

ফ্যাসান-অনুযায়ী সন্ধ্যার পর সাজান ড্রয়িং-রুমটিতে কুঞ্জকে সপরিবারে বসিতে হয়! কুঞ্জ এক ধারে বসিয়া বাংলা সংবাদপত্র অথবা সহজপাঠ্য সাময়িক পত্রাদি পড়ে কিংবা ছবি দেখে, জহর এ ঘরে বড় একটা বসে না, সে তাহার কাজকর্ম্ম লইয়া নিজের ঘরটিতে ব্যস্ত থাকে। নন্দরাণী এই সময়ে আপন মনে যাবতীয় সাংসারিক জটিল তত্ত্বের আলোচনা করে, সুবর্ণ মা'র কাছে বসিয়া থাকে, এই সব সুখ দুঃখের কথায় সুযোগ বুঝিয়া যোগ দেয়, কোনো কোনো দিন অলক আসিলে গল্পের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনীতা সব দিন বাড়ি থাকে না, বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য্যে কিংবা সিনেমায় তাহার অধিকাংশ সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়।

কলিকাতায় নন্দরাণীর সংসার এইভাবেই চলিতে লাগিল।

যে-সুবর্ণ এতকাল বেশ-ভূষা সম্পর্কে উদাসীন ছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকু সাজসজ্জার সাহায্য যে লইত না, সেই সুবর্ণ একদিন এমন চমৎকার সাজিয়া ড্রয়িং-রুমে আবির্ভূত হইল যে সকলেই বিস্মিত না হইয়া পারিল না। কেহ কোনো দিন ধারণা করিতেও পারে নাই যে দেহে এতখানি রূপ ও সৌন্দর্য্যের বিভা বর্ত্তমান।

জহর এ...র এই পরিবর্ত্তনে শঙ্কিত হইল নন্দরাণী, সে বুঝিল সুবর্ণ এখন

রীতিমত মহিলা হইয়া উঠিয়াছে। কুঞ্জ উৎসাহাতিশয্যে বলিয়া উঠিল —চমৎকার, এইবার তোমাতে আমাতে বেড়াতে যাব, চাই কি লাট সাহেবের বাড়ি পার্টিতেও যেতে পারি, সে দিন অলক বাবু বলছিলেন।

জহর কোনো মন্তব্য করিল না, সুবর্ণর এই সজ্জাও পারিপাট্য তাহার ভালোই লাগিল, তবে আধুনিক পোষাকে শ্লীলতার অভাব এ কথাটা বলিতে গিয়া সে থামিয়া গেল।

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে অনীতাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক, তাহার উক্তিতেই সকলের মতামত প্রতিধ্বনিত হইল,—সে বলিল, দিদিমণি, ইউ লুক্ ফাইন, সাদাসিধে ড্রেস্ বটে—তাহার পর সুবর্ণর চারি পাশে ঘুরিয়া বলিল, কিন্তু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে—

এত লোকের সমালোচনায ও মন্তব্যে সুবর্ণ কুণ্ঠিতা হইল কিন্তু কিছু বলিল না। এতকাল সে পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে নজর দেয় নাই বলিয়া চিরদিনই যে সে-বিষয় অবহেলা করিতে হইবে এমন কোন অর্থ নাই। সুবর্ণর শুধু যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা নয় তাহার অন্তরেও তেমন আনন্দ নাই। এই নূতন জীবন সম্পর্কে তাহার আশা ছিল অনেক, কিন্তু ইতিমধ্যেই যেন সহরের এই বিলাসবহুল জীবনের মাধুর্য্য বিস্বাদ লাগিতেছে, ইহার জন্য তাহার নিজের উপরই রাগ হইল বেশী, সহসা এই অর্থলাভে জীবনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হওযা উচিত ছিল বৈকি! সুবর্ণর দুঃখের কারণ পুরাতন জীবন আজো জের টানিয়া চলিয়াছে, নূতন জীবনের এখনও সূচনা হয় নাই।

বাড়ির আর সকলেরই কিছু-না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নন্দরাণীকে নীরবে অনেক কিছুই সহ্য করিতে হয, এই বাধ্যতামূলক সংযমের শিক্ষায় তাহার দুঃখের পরিমাণ অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিলে সত্যই কষ্ট হয়। জহরকে লইয়া সকলেরই একটা আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সে যেন সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকে সে

এমন একটা গাম্ভীর্য্যের পরিধি রচনা করিয়াছে যে সে দিকে ঘেঁষা বড় সহজসাধ্য নয়, তাই জহর সম্পর্কে এ বাড়ির সকলেরই একটা আতঙ্ক-মিশ্রিত সমীহের ভাব।

এই নূতন জীবনে কুঞ্জ ও অনীতার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে,— ইহাই যেন তাহারা এতকাল আশা করিয়াছিল, এই বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইযা দিবার জন্যই তাহারা এতদিন উন্মুখ হইয়া বসিয়াছিল, আজ সুযোগ মিলিতেই তাই ঝাঁপাইযা পড়িয়াছে। কুঞ্জ সুবিধা পাইলেই উৎসুক প্রতিবেশীর সহিত তাহার পার্থিব জ্ঞান এবং সমৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করে, মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে সেখানে ঘুরিয়া আসে—আর অনীতা, তাহাকে পায কে? সে যে কি করিবে তাহা যেন ভাবিয়া পায় না।

কুঞ্জর সহিত কি একটা বৈষযিক আলোচনা করিতে আসিয়া অলক দেখিল সুবর্ণ একা বসিযা আছে। তাহাদের নূতন জীবনে অলক যে ভাবে সাহায্য করিযাছে তাহা সুবর্ণ জানে, তাই অলককে দেখিলেই তাহার মনে স্বভাবতঃ একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগে, সময় সময় তাহাকে নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করিতে শুনিয়া বিরক্ত হইযাছে, তাহার অকারণ কৌতূহলে বিস্মিত হইয়াছে, কিন্তু সে কোনো দিনই অলক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করে নাই, সে মনে করিত তাহাদের জন্য লোকটির মনে হয়ত মমতা জাগিয়াছে। তাই অলক যখন সোজাসুজি বলিয়া বসিল—You have got extremely good taste—

তখন সুবর্ণ শিহরিযা উঠিল, এ মন্তব্যে সে একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল—তাই নাকি?

অলক সুবর্ণর বিরক্তি বুঝিলনা, উৎসাহিত হইয়া পুনরায় বলিল—extremely good taste, এ একটা gift, সকলের থাকে না।

সুবর্ণ এ কথার কোন উত্তর করিল না।

অলক বলিল—আমাদের দেশে পোষাক সম্পর্কে এখনও একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড গড়ে উঠ্‌ল না, যার যা খুসী, সময় নেই অসময় নেই তাই পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

সুবর্ণ বিদ্রূপ করিয়া বলিল—আপনি কি আইনের ফাঁকে আবার ফ্যাসান চর্চ্চা করেন নাকি মিঃ চৌধুরী?

অলক হাসিয়া উঠিল, বলিল—ফ্যাসান চর্চ্চা করি না, তবে কি জানেন, ভালো মন্দ দেখ্‌লে বিচার কর্‌তে পারি তাতে যদি ফ্যাসান এক্সপার্ট মনে করেন, ভালোই; আজকাল এক্সপার্ট হতে ত' আর কারু বাধা নেই—

সুবর্ণ তাহাকে সমর্থন করিয়া বলিল—সে কথা সত্যি, এ যুগে সবাই এক্সপার্ট।

অলক উৎসাহিত হইয়া বলিল—পার্টিতে বা পথে ঘাটে ত' কত রকমই দেখছি, কিন্তু আপনাকে বল্‌তে বাধা নেই যে নারী-প্রগতি এই নমুনায় আমি মোটেই আশান্বিত হতে পারছি না।

সুবর্ণ বলিল—এমনও ত' হতে পারে যে নারী-প্রগতি সম্বন্ধে আপনার ধারণায় ত্রুটি আছে, সাদা চোখে বিচার কর্‌লে হয়ত আশাবাদী হয়ে উঠতেন।

অলক বলিল—এ আমার আকস্মিক আবিষ্কার নয়, অনেক দিনের অভিজ্ঞতার ফল। বেশ ত' আপনি এক দিন আমার সঙ্গে লাঞ্চে চলুন না, অজস্র প্রমাণ দেখিয়ে দেব—

সুবর্ণ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া তাহার আপত্তি জানাইল।

অলক আবার বলিল, সামনের বুধবার গ্রেট ঈষ্টার্ণে আসবেন?

সুবর্ণ দৃঢ়তার সহিত শুধু বলিল—অসম্ভব!

অলক অত্যন্ত ধীরভাবে ও বিশেষ সাবধানে একটি সিগারেট ধরাইল-

তারপর হাসিয়া বলিল—আপনার মত মেয়ের নাম "No girl",—সব তাতেই না—

ব্যক্তিগত আলোচনায় সুবর্ণর স্বাভাবিক আপত্তি আছে, এই কথার মধ্যে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার আভাষ পাইয়া সুবর্ণ বিশেষ বিরক্ত হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—তার মানে ?

অলক তেমনই পরিহাসভরে কহিল—নো গার্ল, সব কথাতেই যার আপত্তি, সব কথা মানে এখানে অবশ্য লাঞ্চ। আর যারা 'ইয়েস্ গার্ল' তারা হলে নিশ্চয়ই বল্‌তো 'Oh yes, I' d love to,' আপনার ছোট বোন অনীতা হয়ত এই উত্তরই দিতেন।

এ কথায় সুবর্ণ আরো উত্তেজিত হইয়া কহিল—অনীতা সম্পর্কে এমন একটা বিশ্রী ধারণা করার কোনো অধিকার আপনার নেই।

. সুবর্ণর উত্তেজনায় অলক দমিল না, সে শান্তভাবে কহিল—আপনি বৃথা রাগ কর্‌ছেন, লাঞ্চে যাওয়ার মধ্যে ত' কোনো অপরাধ নেই, আপনিই বলুন না—

ইহার পর সুবর্ণ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পায় না, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—না দোষ কিছু নেই, তবে—

অলক যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত বলিল—তা'হলে বুধবার চলুন না! ধরুন আমার বাড়ীতে যদি নিমন্ত্রণ কর্‌তাম, যেতেন না? এ না হয় বাড়ী নয়, হোটেল। এতে আপত্তির কি কারণ থাক্‌তে পারে আমি ত' বুঝতে পার্‌ছি না।

এই অনুরোধে সুবর্ণ বিশেষ বিব্রত হইয়া বলিল—আপত্তি নয়, কিন্তু—

অলক বলিল—কিন্তু-টিন্তু ভুলে যান,—বুধবার তা'হলে কথা রইল।

সুবর্ণ অতি কষ্টে বলিল—আচ্ছা—

তাহার এই দ্বিধাকুণ্ঠিত ভাব অলকের চোখে ধরা পড়িল, হাসি

চাপিবার জন্য সে রুমালে মুখ মুছিতে লাগিল, তারপর একটু সংযত হইয়া বলিল—গ্রেট্ ঈষ্টার্ণে আগে গিয়েছেন নিশ্চয়ই—চমৎকার জায়গা—

সুবর্ণ বলিল—না।

অলক বলিল—আপনি নিউম্যানের দোকানের সামনে থাক্‌বেন, আমি ঠিক পৌণে একটায় পৌঁছব, কেমন রাজী ত'?

সুবর্ণ সলজ্জ ভঙ্গীতে হাসিয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

এই সময় কুঞ্জ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সুবর্ণ অলককে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল। সুবর্ণর মনে হইতে লাগিল অলক লোকটি তেমন সহজ নয়, তাহার প্রস্তাবে রাজী না হইলেই হয়ত ভালো হইত, তারপর গ্রেট্ ঈষ্টার্ণ, ছোটখাটো হোটেলে দু'চারবার জহরের সঙ্গে সে গিয়েছে বটে কিন্তু গ্রেট্ ঈষ্টার্ণ, সেখানকার কায়দা-কানুন তাহার জানা নাই। তারপর যদি অলক না আসিতে পারে, তাহা হইলেই বা সে কি করিবে? ছাপা মুর্শিদাবাদী সিল্কের সাড়ি পরিলেই চলিবে, না ক্রেপ কিংবা জর্জ্জেট? এই ধরণের সহস্র চিন্তায় সুবর্ণ আকুল হইয়া পড়িল, অলক তাহাকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করিয়া ভালো বিপদেই ফেলিয়াছে!

অলক কিন্তু সুবর্ণ আসিবার অনেক আগেই নিউম্যানের সাম্‌নে দাঁড়াইয়াছিল, বাদামী রঙের সুটে তাহার পাত্‌লা চেহারাটি বিশেষ স্মার্ট দেখাইতেছে, সুবর্ণর সাড়িখানির সহিত অলকের সুটের আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। অলক সেদিন যে সাড়িখানির প্রশংসা করিয়া আসিয়াছিল, সুবর্ণ অচেতন মুহূর্ত্তে আজ তাহাই পরিয়া আসিয়াছে।

অলককে দেখিয়া সুবর্ণর মুখখানি প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। অলক বলিল—চলুন, একটা ভাল টেবিল দেখে বসা যাক্—

সুবর্ণ নীরবে তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। সেই দ্বিপ্রহরে হোটেলের এই কক্ষটি অজস্র লোকের ভীড়ে ভরিয়া গিয়াছে, কত সাহেব,

মেম, তাহার মধ্যে দেশী-সাহেব মেমের সংখ্যাও বড় নগণ্য নয়। এতগুলি প্রাণীর ভদ্রতাসূচক চাপা গুঞ্জনে সেই প্রশস্ত কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই জনারণ্যের মধ্যে সুবর্ণ দিশেহারা হইয়া পড়িল। অলকের এই হোটেল অতি পরিচিত, হুকুম শুনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাহার পরিচিত বয় ছুটিয়া আসিল, সুবর্ণর মনে পড়িল জহরের সঙ্গে কতবার হোটেলে গিয়া পনের মিনিট 'বয়'-এর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইয়াছে। বিস্ময়াহত-দৃষ্টিতে সুবর্ণ টেবিলের পর টেবিল অতিক্রম করিয়া গেল।

একটু অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন টেবিল পছন্দ করিয়া উভয়ে বসিয়া পড়িল, তারপর অলক কহিল—এই সাড়িটায় কিন্তু আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে, সত্যি আমি ভাবতেই পারিনি যে আপনি এটা আজ পরবেন। তারপর সে এ কথার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া টেবিল হইতে একখানি বৃহৎ শাদা কার্ড তুলিয়া লইল, সুবর্ণর সামনেও একখানি তদনুরূপ কার্ড ছিল, সুবর্ণ অন্যমনস্কভাবে সেইটি দেখিতে লাগিল।

অলক কার্ডখানি কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিল—Are you going to choose your lunch, or am I ?

সুবর্ণ হঠাৎ বলিয়া উঠিল—I' ll choose, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া কহিল—আপনিই ঠিক করুন না, এর আবার পছন্দ অপছন্দ কি !

অলক খুসি হইয়া কহিল—থ্যাংকস্, আমার যা পছন্দ অপরের সেই পছন্দ হলেই আমার ভালো লাগে, নয় ত' মনে করুন আপনার ডিস্‌টা এমন লোভনীয় হতে পারে, যাতে ভদ্রতার খাতিরে মুখে কিছু না বললেও আমি হয়ত' চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে পারি।

অলকের এই রসিকতায় সুবর্ণ হাসিয়া উঠিল। অপেক্ষারত ওয়েটারকে হুকুম দিয়া অলক নিশ্চিন্তভাবে একটি সিগারেট ধরাইল,

তারপর সুবর্ণর মুখের দিকে সহাস্যে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আপনাকে এই লাঞ্চে ডেকেছি কেন জানেন?

সুবর্ণ মাথা নাড়িয়া জানাইল যে এ রহস্যের অর্থ তাহার জানা নাই।

অলক তাহার হাসি থামাইয়া গম্ভীর মুখে বলিল—আপনাকে আজ নিমন্ত্রণ করার একমাত্র কারণ এই যে আপনার সঙ্গে আমার একটি ঝগড়া আছে, দারুণ ঝগড়া—

সুবর্ণ বিস্মিত দৃষ্টিতে অলকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; এ কথার কোনো জবাব দিল না।

অলকের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে তাহার বিশেষ সন্দেহ হইল, হয় লোকটি পাগল নয় ত' বদমায়েস, এই কথাই তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল! অথচ টেবিলের উপর সদ্যপরিবেশিত খাদ্যের আকর্ষণও বড় কম নয়, কিন্তু অলক কি অস্ত্রের সাহায্যে এই বিচিত্র খাদ্যটি উদরস্থ করিবে তাহা না দেখিয়া সুবর্ণ আরম্ভও করিতে পারে না। অলক যেন সহসা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে, সুবর্ণকে রাগাইবার জন্যই হয়ত, এ তাহার একটা নূতন ফন্দী। অবশেষে স্মোক্‌ড্ স্যামনের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সুবর্ণ কিঞ্চিৎ আত্মস্থ হইল!

আহারের অবসরে সুবর্ণ অলকের কৌতূহলী চোখের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই সেই প্রশস্ত হল্‌টির চারিদিক দেখিতে লাগিল। বসিবার বন্দোবস্ত প্রথমটা তাহার তেমন ভালো লাগে নাই, এখন কিন্তু মনে হইল ইহাই ভালো, সারা কক্ষটি এই জায়গাটি হইতে বেশ ভালোই দেখা চলে। কি আশ্চর্য্য সব মানুষ! বিচিত্র পরিচ্ছদ, বিভিন্ন ভঙ্গী, কাহারও কণ্ঠের মুক্তার মালা দেখিয়া চমকিত হইতে হয়, অথচ সম্পূর্ণ জিনিষটাই হয়ত' ঝুটা। একটি কুৎসিৎ-দর্শনা প্রৌঢ়া রমণীর হাতে এক ফ্যাসনেবল্ তরুণ অবলীলাক্রমে চুম্বন করিয়া বসিল। আহা এমন চমৎকার মেয়েটি ওই মোটা ভদ্রলোকটির স্ত্রী নাকি! এমনই অবাক্তর

চিন্তা-প্রবাহে সুবর্ণ গা ভাসাইয়া দিয়াছে, এমন সময় অলক সহসা বলিয়া উঠিল, কি এত ভাব্‌ছেন বলুন ত’ ? আমি কিন্তু বলতে পারি—

সুবর্ণ সচকিত হইয়া কহিল—বেশ ত’ বলুন না ?

অলক একটু হাসিয়া বলিল—আপনার মা’র কথা ভাব্‌ছেন, মনে কর্‌ছেন কোন্‌টি আপনার মা হ’তে পারেন, কেমন তাই ত’ ?

সুবর্ণ তৎক্ষণাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—কখনই না, মিছিমিছি এ কথা ভাব্‌তে যাব কেন ? সুবর্ণ হয়ত’ আরো কিছু বলিত, কিন্তু সে এই মাত্র ঝগড়া করিবে না স্থির করিয়াছে তাই চুপ করিয়া গেল।

অলক বলিল—সেই কথাই ভাবা স্বাভাবিক, তিনি হয়ত’ এখানে মাঝে মাঝে আসেন।

সুবর্ণ বলিল—আপনি তাঁকে চেনেন নাকি ? তাঁর সঙ্গে দেখা করার কিন্তু আমার মোটেই ইচ্ছে নেই।

মাথাটি অলসভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া অলক ধীরভাবে বলিল—আমার ওপর নিশ্চয়ই আপনার রাগ হচ্ছে, আমি বড় বিরক্ত করি, না ?—

সুবর্ণ বলিল—আপনার প্রশ্নের কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

অলক হাসিয়া বলিল—ঠিক বলেছেন, কিন্তু এই বাজে কথা থামাতে হ’লে কথা আপনাকেই কইতে হয়, আপনি যে নীরব। আপনিও ত’ জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পারেন যে আমরা ক’টি ভাই, কি খাই, কি করি ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের প্রশ্ন হ’তে পারে ?

ম্লান হাসিয়া সুবর্ণ বলিল—একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে—

উৎসাহিত হইয়া অলক বলিল—বেশ ত’, কি জান্‌বার আছে বলুন !

সুবর্ণ শান্ত-কণ্ঠে কহিল—কতদিন লোকনাথবাবুর ছেলেমেয়েদের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস কর্‌বো মনে করেছি, কিন্তু সুযোগ হয় নি—

হতাশ হইয়া অলক বলিল—এই কথা ! আমি ভেবেছিলাম বুঝি

আমার কথাই কিছু জিজ্ঞেস্ করবেন। তা লোকনাথবাবুর ছেলেমেয়েদের কথা কি-ই বা বলি! হয়ত' লাইবেল্ হ'য়ে পড়্বে, তাঁরা বড়লোক, অনেক কিছুই জানেন, সব কিছু বোঝেন, বড়লোকদের যা করা উচিত তাই তাঁদের করণীয়, এক কথায় যেন নোয়েল কাওয়ার্ডের নাটকের এক-একটি চরিত্র সংসারে অবতীর্ণ হয়েছেন—

সুবর্ণ প্রশ্ন করিল—কিসের চরিত্র?

এ প্রশ্নে অলক সুবর্ণর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকাইল, তারপর কহিল, কি বল্লেন? নোয়েল কাওয়ার্ড-এর নাম শোনেন নি?

সুবর্ণ তাচ্ছিল্যভরে কহিল—নিশ্চয়ই শুনেছি, Cavalcade-এর লেখক ত'? ভারী চমৎকার কিন্তু—

অলক সজোরে হাসিয়া উঠিল। সুবর্ণর দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—You really are a pearl!

এই বলিয়া অলক গম্ভীরভাবে আহারে মনোনিবেশ করিল। ইতিমধ্যে কফি আসিয়া পড়িল বলিয়া অলক মুখ তুলিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সুবর্ণর মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে কহিল, আপনাকে একটা গোপন কথা বলা হয়নি, শুনে হয়ত' চমকে উঠ্বেন—Some day, some time, I'm going to ask you to marry me.

সুবর্ণ স্তব্ধভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিস্ময়ের ঘোর যেন আর কাটে না, তারপর কহিল—কি বল্লেন?

অলক লঘুভাবে বলিল—আর কেন ছলনা, আপনি ত' স্বকর্ণেই শুনেছেন কি বলেছি। আর একটি গোপন কথা এই সঙ্গে বলি, যেদিন এ প্রস্তাব আপনার কাছে করবো, সেদিন আপনি গম্ভীর কণ্ঠে বল্বেন—'নো'!

সুবর্ণ তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিল—সেটা তবু সম্ভব।

অলক হাসিয়া বলিল—শুধু সম্ভব, It's a certainty, তবে আপনি

'না' বল্লেও আমি খুসী হব। কিন্তু এ প্রস্তাব কি আগে কেউ করেছে?

সুবর্ণ উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিল—টাকা পাবার আগে কেউ বলেন নি।

অলক এ কথার কোনো উত্তর করিল না—ফুলদানি হইতে একটি ফুল তুলিয়া সুবর্ণর হাতে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল—পাগলামী কোরো না সুবর্ণ, অর্থ আমারও আছে। তোমাদের টাকায় আমার লোভ নেই, তবে তোমার ওপর আমার যথেষ্ট লোভ আছে, এই কথাটা স্পষ্ট করে' জানাবো বলেই তোমাকে আজ ডেকেছি—

নিষ্প্রাণ-কণ্ঠে সুবর্ণ বলিল—আমাকে অপমান কর্‌বার জন্যই ডেকেছেন বুঝেছি, এখানে আপনার যা খুসী বলে যান, আমার বল্‌বার কিছুই নেই।

অলক মৃদু-কণ্ঠে কহিল—ছি, অমন চেঁচিও না সুবর্ণ, ওই দেখো ও টেবিল থেকে ভদ্রমহিলা তোমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন, ভাব্‌ছেন উনি যদি তোমার মত সুন্দরী হতেন! কিন্তু তা যে হয় না, ওঁর গলাটি ছোট—তারপর দেখ কোণের টেবিল থেকে ভদ্রলোকরা সমানে তোমার দিকেই চেয়ে রয়েছেন—

সুবর্ণ অনেক আগেই তাহা লক্ষ্য করিযাছে, সে কিছুই বলিল না।

অলক বলিল—ওঁরা কি ভাবছেন তাও আমি জানি, কিন্তু সে কথা যাক্, এ ঘরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ আমার সাম্‌নে বসে—

সুবর্ণ বলিল—সে ত্রুটী আমার অনিচ্ছাকৃত—

—না, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না, হোপ্‌লেশ, একটুতেই তুমি রেগে যাও—

পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ভুলিয়া সুবর্ণ প্রখর ভঙ্গীতে বলিল—আপনি নিজেকে খুব ক্লেভার মনে করেন, না? আপনি যদি মনে করে' থাকেন এখানে যাঁদের দেখ্‌ছেন তাঁদের নিয়েই পৃথিবী, তাহ'লে বড়ই ভুল করেছেন, পৃথিবী আরো বড়।

অলক বলিল—Splendid! তবু যাহোক একটা মানুষের মতো কথা হোল এতক্ষণে।

সহসা সুবর্ণর মনে হইল আজিকার ব্যাপারে সে অতিথি মাত্র। হোষ্টের যতই ত্রুটী থাক তাহা ক্ষমার্হ। তাই সুবর্ণ শান্ত হইয়া রহিল।

সুবর্ণ মৃদুকণ্ঠে কহিল—একস্‌কিউজ্‌ মি, আমার-ই দোষ।

অলক হাসিয়া বলিল—দোষ কিছুই হয়নি, তবে ক্ষমা করতে পারি একটি সর্ত্তে—

সুবর্ণ ভীরুভাবে কহিল—সর্ত্তটি কি?

অলক গম্ভীরভাবে কহিল—আপনি-বর্জ্জন এবং অধমের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুকূল মনোভাব—

মেঘ কাটিয়া গেল, সুবর্ণ এতক্ষণে আবার হাসিল।

১০

নন্দরাণীর সংসারে যে পারস্পরিক সংযোগ এতকাল অবিচ্ছেদ্য ছিল তাহাই যেন ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। গ্রেট্ ঈষ্টার্ণের ঘটনার পর অলক আবার সুবর্ণকে সিনেমা দেখিতে লইয়া গিয়াছে, সুবর্ণও বেশ সহজেই এবারকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে, এতদ্বারা অবশ্য মনে করিবার কোনও কারণ নাই যে সুবর্ণর মনোভাব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অলকের ব্যবহার মাঝে মাঝে রূঢ় ও রুক্ষ হইলেও যেন নূতন জগৎ সুবর্ণ দেখিতে চায়, একমাত্র অলক-ই তাহার সুযোগ্য পথ-প্রদর্শক। তারপর শুধুমাত্র সুবর্ণর মুখে একদা এক সময় বিবাহের প্রস্তাবের উত্তরে সংক্ষিপ্ত "না"টুকু শুনিবার জন্য অলক যেভাবে আগ্রহান্বিত তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা যায় না।

সেই দিনই সন্ধ্যায় কলেজ হইতে ফিরিয়া অনীতা কুঞ্জর গলা জড়াইয়া ধরিল। অনীতার দৌরাত্ম্যে সকলেই অভ্যস্ত, আজ আবার সে কি নূতন আব্দার ধরিবে কুঞ্জ তাহাই ভাবিতে লাগিল, কহিল—কি হোল রে পাগ্‌লী, বল্ না! অনীতা কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট সুর ঢালিয়া কহিল—চলো না বাবা এম্পায়ারে—ভালো নাচ আছে, মন্দাকিনী দেবীর সাগর-নৃত্য, তার সঙ্গে আবার নৃত্যনাট্য 'বসন্ত-হিল্লোল', যাবে বাবা?

কুঞ্জ ধীরকণ্ঠে বলিল—এখন ত' পৌনে ছ'টা, সাড়ে ছ'টায় আরম্ভ, তোমার মা'র যদি আপত্তি না থাকে ত' যেতে আর কি—?

কুঞ্জ ভাবিতেও পারে নাই যে নন্দরাণী একবিন্দু আপত্ত করিবে না, সুতরাং নন্দরাণী যখন স্বচ্ছন্দে অনুমতি দিয়া বসিল তখন সে বিস্মিত হইয়া গেল। নন্দরাণী শুধু কহিল—আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের মাথাটি খাচ্ছ। যাবে যাও, তবে ঠাণ্ডা লাগিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসো না যেন, ভালো করে' গরম জামা-টামা পরে যাও—

কুঞ্জ ইহার কারণ বুঝিতে পারিল না, পারিবার কথাও নয়। নন্দরাণী নিভৃতে জহরের সহিত কথা কহিবার একটা সুযোগ খুঁজিতেছিল, তাহার অখণ্ড গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে কি রহিয়াছে তাহা জানিবার জন্য নন্দরাণীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার আর সীমা ছিল না। তাই সে সহজেই অনীতার প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেল।

অনীতা ও কুঞ্জর ট্যাক্সির আওয়াজ ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

বারান্দা হইতে জহরের ঘরে ফিরিয়া নন্দরাণী দেখিল যে গভীর মনোযোগ সহকারে সে কি একখানি বিলাতী পত্রিকা পড়িতেছে। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া গভীর মমতাভরে নন্দরাণী জহরের দিকে চাহিয়া রহিল, জহর তাহার উপস্থিতি বুঝিতে পারিল না। নন্দরাণী আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে জহরের সহিত তাহাকে একটা বোঝাপড়া করিতেই হইবে, জহরের ওপর এ

সংসারে একমাত্র তাহারই যা কিছু প্রভাব আছে, কিন্তু কিভাবে যে কথাটা পাড়া যায় তাহা নন্দরাণী ভাবিয়া পায় না। অবশেষে নন্দরাণী জহরের মাথায় অবিন্যস্ত দীর্ঘ চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া কহিল—দিনরাত কি এত পড়িস বাবা? তবে নভেল নাটকের চেয়ে এসব পড়া ঢের ভালো—

জহর একটু হাসিয়া বলিল—নভেল নাটকে আমার কি হবে মা, ও-সব আমি পড়তে পারি না, তারপর ঐ সিনেমার কাগজ—অনীটা যে কি করে' ও-সব পড়ে তা আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না—

নন্দরাণী জহরের পাশের চেয়ারটিতে বসিতে বসিতে ঠিক করিল যে এই কথার সূত্র ধরিয়াই আজ সকল সমস্যাগুলি মিটাইয়া লইতে হইবে, সমুদ্রবক্ষ হইতে এই নিমজ্জমান প্রাণীটিকে বাঁচাইয়া তুলিতেই হইবে। নন্দরাণী তাচ্ছিল্যভরে বলিল—অনী হোল মেয়েমানুষ, কি হবে ওর লেখাপড়ায়! তোমরাই তখন ছাড়লে না তাই, নইলে ওর পড়াশোনা যা হচ্ছে তা কি আর বুঝি না বাবা! ও-বয়সের মেয়েদের যে এই সব দিকেই ঝোঁক বেশী—

জহর একটু উত্তেজিত ভঙ্গীতে কহিল—তোমরাও ত' মেয়ে ছিলে মা, কি পড়তে তখন?

নন্দরাণী হাসিয়া কহিল—তোর মার বিদ্যে ত' কত, তা ছাড়া সে সময় অত-শত ছিল না বাপু, তখন লোকে রামায়ণ মহাভারতই বেশী পড়তো।

জহর উৎসাহিত হইয়া বলিল—তবে, রামায়ণ মহাভারত পড়ে সেকালের সব পবিত্র আদর্শ শিক্ষা হতো, আর এখন—

নন্দরাণী এ প্রসঙ্গে কিছু কথা কহিল না, তারপর সহসা আবেদনের ভঙ্গীতে বলিল—তুই কি অনীর ওপর রাগ করেছিস্ জহর?

জহর তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—সে কি মা, রাগ কর্‌বো কেন?

নন্দরাণী গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—অনী-সুবর্ণ তোমার দুই বোন, ওদের

তুমি যথেষ্ট ভালোবাসতে, সময় পেলেই ওদের নিয়েই তুমি থাক্‌তে, আজকাল ওদের সঙ্গে তোমার কথা কইবারও সময় হ'য়ে ওঠে না।

জহর শান্তকণ্ঠে কহিল—মনটা খারাপ ছিল, কিছুদিন আমি ভেবেই ঠিক কর্‌তে পারিনি কি কর্‌বো, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত আদর্শ যদি এক মুহূর্ত্তে চূর্ণবিচূর্ণ হ'যে যায়, তখন কি হয় মনের অবস্থা? জানো মা, বিহারের ভূমিকম্পের কথা কাগজে পড়ে আমি কিছুই বুঝিনি, কিন্তু যেদিন অলকবাবুর মারফৎ এ খবর পৌছল সেদিন যেন আমার চোখের সাম্‌নে বিহারের সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প বায়স্কোপের ছবির মত ভেসে উঠল, এক মুহূর্ত্তে হাজার হাজার সংসার ছারখার হ'যে গেল, বাপ-মা, ভাই-বোন সব এক মুহূর্ত্তেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর চাপা পড়ে রইল, আমার জীবনেও তেমনি একটা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটে গেল—

নন্দরাণী সান্ত্বনার সুরে বলিল—তারপরও ত' আবার সেই সর্ব্বনেশে জায়গায় আজ আবার নতুন ক'রে মানুষ বাসা বাধছে। ওলোট-পালোট হয়েছে সত্যি, তা' বলে মনে মনে দিনরাত সেই কথা ভেবে ভেবে শরীরটা যে একেবারে মাটি হ'যে গেল বাবা—

জহর সান্ত্বনার সুরে কহিল—এখন আমি অনেকটা সাম্‌লে নিয়েছি, সময়ে সবই সয়। তুমি আমার মা নও—এ যে আমার কত বড় শাস্তি, কত বড় দুঃখ তা বোঝাতে পারবো না। আমার ব্যবহার রুক্ষ হ'য়ে উঠ্‌ল, মনে শান্তি না থাক্‌লে মেজাজ সপ্তমে চড়ে, কিন্তু ক্রমশঃ বুঝ্‌লাম ভুল আমারই, তোমার ত্রুটী নেই, তুমি যে আমার কতখানি আপন—যত দিন যেতে লাগল ততই স্পষ্ট হ'য়ে এল। তোমার ঋণের পরিমাণ কল্পনায় আসে না।

জহরের আবেগসিঞ্চিত কথাগুলি নন্দরাণীর অন্তর স্পর্শ করিল, সে কহিল—এ কথা তুই না বললেও আমি জানি জহর, একদিনেই কি তোর মা পর হ'য়ে যেতে পারে, তবে বাবা তোর মাকে যে চোখে দেখিস্

অনী-সুবর্ণকে তা থেকে তফাৎ করিসনি। ওঁর-আমার কথা ধরি না, আমরা জীবনটা কাটিয়ে এনেছি, যে কটা দিন আছি একরকম চল্‌বে, তবে তোমাদের তিন জনের বিচ্ছেদ আমি কল্পনাও কর্‌তে পারি না, ভগবান করুন সে দিন দূরে থাক্, প্রয়োজনে ও বিপদে আপদে পরস্পর সাহায্য কর্‌তে কখনো কুণ্ঠিত হয়ো না, সেই হবে আমার পরম সান্ত্বনা।

যথেষ্ট আন্তরিকতাভরে জহর কহিল—সে তোমায় বল্‌তে হবে না মা, এ আমি দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি, অনী-সুবর্ণ কোনোদিন আমার কাছে পর হয়ে যাবে না।

নন্দরাণী ব্যস্ত হইয়া কহিল—না না দিব্যি কর্‌তে হবে না, তোমার মুখের কথাই ঢের। ইহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া নন্দরাণী আবার বলিল—লোকনাথবাবুর ওপর তোর আর তেমন আক্রোশ নেই ত' বাবা, যত অপরাধই তাঁর থাক্ তবু তিনি তোমার বাবা—এ কথাটা মনে রেখো—

জহর বলিল—না, সে সব ঠিক করে ফেলেছি—

এই বলিয়া সে হাতের বইখানি নামাইয়া রাখিয়া, টেবিলের উপর হইতে অন্য একখানি বই খুঁজিয়া বাহির করিল। নন্দরাণী ভাবিয়াছিল কথা এখানেই শেষ হইবে, কিন্তু জহর আবার নূতন করিয়া সুরু করিল—এই দেখ মা, আমি তাঁদের সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করে পড়্‌লাম, লোকনাথবাবু লোক তেমন খারাপ ছিলেন না, তবে কি জান—তাঁর অগাধ টাকা, মিলের মালিক, ব্যাঙ্কের মালিক, আরো কত কি! ভবিষ্যতে এ সব কিছুই হয়ত থাক্‌বে না, সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

নন্দরাণী স্তব্ধ বিস্ময়ে জহরের বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। জহর বলিতে লাগিল—আমাদের যা সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের এই অভাব—এ সমস্তই ভবিষ্যতে অন্য আকার ধারণ কর্‌বে, আর কি হোল জানো মা, এ সব

দেখে শুনে আমি সোস্যালিজম্ ছেড়ে দেব ঠিক করেছি, অনেক তলিয়ে দেখ্‌লুম কিছুতেই কিছু না—যে নামেই ডাকো জল—‘জল’।

জহরের পাণ্ডিত্যে নন্দরাণী বিস্মিত হইয়া কহিল—আমরা কি বুঝি বাবা, তবে তোর সোসাইটি না কি বল্লি, ও বুঝি স্বদেশীর ব্যাপার? তা তুই কি স্বদেশী ছেড়ে দিবি নাকি?

জহর বলিল—স্বদেশী কি ছাড়া যায় মা? তবে বক্তৃতা করে, বিবৃতি দিয়ে স্বদেশী না করে অন্য ভাবে স্বদেশী কর্‌বো ঠিক করেছি। দেশের অভাব দুর কর্‌তে হ’লে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি আগে দরকার, তাই আমি ঠিক করেছি—

নন্দরাণী শুষ্ক-কণ্ঠে কহিল—কোন কাজকর্ম্মের একটা ঠিক করা উচিত ত’? তখন ঝোঁকের মাথায় অমন চাকরীটা ছেড়ে দিলি!

জহর উত্তেজিত হইয়া বলিল—এখন আমি সবাইকে চাকরী দেব, সব ঠিক করে ফেলেছি, দরকার শুধু টাকার—

বিস্মিত নন্দরাণী জহরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল—ভেতর ভেতর এত সব ঠিক করেছিস্, অথচ আমাকে কিছু বলিস্‌নি কেন জহর?

জহর বলিল—সমস্ত ব্যবস্থা না করে আমার মতলব সবাইকে বলে লাভ কি, শেষে যদি কিছু না করে উঠ্‌তে পারি তখন যে আর লজ্জার সীমা থাক্‌বে না, মা।

নন্দরাণী আগ্রহভরে কহিল—বেশ ত’, তুই কি ঠিক করেছিস্, কি কর্‌তে চাস্ বল্, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

—আমি গ্যাসের কাজ ভালো জানি, গ্যাস্ কোম্পানীর কাজেই এতদিন কাটালাম—তাই ভেবেছি নিওন গ্যাসের একটা কোম্পানী খুল্‌ব, সমস্ত ঠিক করে রেখেছি। বাজার আমার জানা, এখন দরকার মূলধনের,

অনেক টাকার মূলধন চাই।—দৃঢ় দীপ্ত কণ্ঠে জহর নন্দরাণীর কাছে তাহার আবেদন জানাইল।

নন্দরাণী বুঝিল জহর এই ভাবেই ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে চায়, তথাপি তাহাকে নিরুৎসাহ করা যায় না, তাই জহরকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যেই কহিল—কত টাকা মূলধন দরকার, জহর? তুমি যদি মনে করে থাক এ কাজই ভালো চালানো যাবে, তাহ'লে টাকা আমি দেবার ব্যবস্থা করবো—

জহর বলিল—সব টাকা আমি চাই না, আপাততঃ কুড়ি কিংবা পনের হাজার টাকা আমাকে দাও, বাকী টাকা আমি শেয়ার বেচে তুলে নেব।

নন্দরাণী বলিল—সে যে অনেক টাকা, আচ্ছা ওঁকে বলবো—

জহর বলিল—শুধু বলা নয়, টাকাটা জোগাড় করে দিতেই হবে।

নন্দরাণী আবার বলিল—অনেক টাকা—

জহর বলিল—নতুন কারবার হিসাবে ও টাকা কিছুই নয়, তবে বাকী টাকা আমি তুলে ফেল্‌ব; না হয় টাকাটা আমাকে ধার দাও—

নন্দরাণী এ কথায় বিশেষ ব্যথিত হইয়া বলিল—তোকে আবার ধার দেব কি? তোর টাকা তুই নিবি, উনি রাজী হবেন-ই।

জহর উৎসাহাতিশয্যে বলিল—যখন এই কারবার গড়ে তুলবো তখন দেখ্‌বে যে জহর কি কাণ্ড করতে পারে!

জহরকে টাকা দিতে কুঞ্জ কোনোরূপ ইতস্ততঃ করিল না, বরং বেশ আনন্দভরেই সে টাকাটা জহরের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল—শুনলুম তুমি কারবার করবে ঠিক করেছ, চাকরীতে আর কিছু হবে না। আমারও দেখ না বরাবরই কারবারের দিকে ঝোঁক, তবে তখন পয়সা ছিল না, অল্প মূলধনের কারবার—কাজেই কিছু করতে পারিনি, এখন তোমার ব্যবসা হ'লে আমি নিজেই অর্দ্ধেক দেখাশোনা করবো।

পিতৃত্বের স্বাভাবিক স্নেহভরে কুঞ্জ কথাগুলি বলিয়াছিল, কিন্তু জহরের দিক হইতে এ বিষয়ে বিশেষ কোন আগ্রহ না দেখিয়া কুঞ্জ তাহার ব্যক্তিগত সাহায্যের কথা দ্বিতীয়বার আর উল্লেখ করিল না।

টাকা পাইয়া জহর আবার তাহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্যের অতলে ডুবিয়া রহিল, সে যে কি করিতেছে তাহা বাড়ীর লোকের বাহির হইতে জানিবার বিশেষ কোনো উপায় রহিল না।

১১

কঠিন রোগ-ভোগের পর এমন একটা শারীরিক দুর্ব্বলতা দেহ মনকে অপটু করিয়া রাখে যাহাকে অসুস্থতার অঙ্গ হিসাবেই স্বীকার করিতে হয়। কিছুকাল আগে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিয়া সুবর্ণ যে দুঃখকর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, এখন বারবার তাহার সেই কথাই মনে হয়। দারিদ্র্য-ব্যাধির কবল হইতে সে মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু স্বাস্থ্যকর পরিপূর্ণ-জীবন ভোগ করিবার শক্তি সে কিছুতেই সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না এ জীবনে সে কোনোদিন তাহা ভোগ করিতে পারিবে কি না সে বিষয়েও তাহার মনে সন্দেহ আছে।

এদিকে অলকের সংস্পর্শে তাহার জীবনধারা ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। অলক যেন পণ করিয়া বসিয়াছে সুবর্ণকে সে রীতিমত সোসাইটি গার্ল বানাইয়া ছাড়িবে।

সিনেমা পর্ব্ব শেষ হইবার পর অলক সুবর্ণকে মু্যজিয়মে শিল্প-প্রদর্শনী দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। সুবর্ণকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য অলক যে স্কীম্ করিয়াছিল সঙ্গীত, শিল্প, এটিকেট ও ফরাসীভাষা-শিক্ষা প্রভৃতি তাহার অন্তর্গত, সুতরাং শিল্প-প্রদর্শনী দেখিতেই হইবে।

অলকের আশঙ্কা ছিল যে সুবর্ণর হয়ত' ছবি ভালো লাগিবে না, কারণ ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে তাহার নিজের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষকের গাম্ভীর্য্যে সে তাহার এই ছাত্রীটিকে লইয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে পরম সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্যাটালগ্ দেখিয়া ছবির নাম, শিল্পীর নাম এবং ছবির মূল্য ইত্যাদি সুবর্ণকে বলিয়া যাইতে লাগিল। দুই-চারিজন খ্যাতনামা শিল্পীর ছবি সম্পর্কে সাময়িক পত্রাদিতে পঠিত মন্তব্যাদি তাহার নিজস্ব মতবাদ বলিয়া চালাইল, চিত্র-শিল্পে আধুনিকতা, সার-রিয়ালিজম্, সিলভাডর ডালি, সীজাণ্ ও কিউবিজম্, অবনী ঠাকুর, যামিনী রায়, হেমেন মজুমদার, সব একসঙ্গে বলিয়া গেল। সুবর্ণ কিছু বুঝিল, কিছু বা বুঝিল না, তথাপি গভীর মনোযোগ সহকারে অলকের শিল্প-আলোচনা শুনিতে লাগিল।

অলক বলিতেছিল—প্রতীক্‌বাদী শিল্পীর অভ্যুদয় হয় যুদ্ধের ঠিক আগে। কিছু পুরাণো, কিছু নূতন এরই সংমিশ্রণে নূতন রূপসৃষ্টির ব্যবস্থা হোল। প্রাচীন শিল্পীর ভাষাকে আশ্রয় করে, তাঁরা নূতন জীবনের নূতন ভাব ও রসের প্রতীক্ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলেন।

সুবর্ণ বলিল—তা ত' করলেন, কিন্তু রূপ যে কতখানি খুলল—এটা কি তাঁরা স্বয়ং বুঝতে পারলেন না ?

অলক বলিল—আচ্ছা, তোমাকে সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, নন্দলালের গীতাঞ্জলীর ছবি দেখেছ ? সেগুলি অনেকটা এই ধাঁচের, হিমালয়-শিখরে উপবিষ্ট 'শিবে'র ধ্যানমূর্ত্তির প্রতীক্ আদর্শ করে রবীন্দ্র-নাথের নূতন যুগের নূতন বাণী শিল্পী রূপায়িত করেছেন, সেই হোল প্রতীক্ চিত্র—Symbolic art.

সুবর্ণ বলিল—বুঝেছি, সেই 'Make me thy Poet, O Night, Veiled night—'

সুবর্ণর এই সময়োপযোগী উক্তিতে অলক খুসী হইল।

সর্ব্বশেষ কক্ষে আসিয়া অলক বলিল—বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পীরা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধিকারী এ কথা—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুবর্ণ কি করিতেছে দেখিবার জন্য পিছন ফিরিতেই অলক দেখিল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন, আশে পাশে কোথাও সুবর্ণ নাই।

অলককে ফিরিতে দেখিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—কি বল্‌ছেন মশাই আপনি পাগলের মতো, হাতগুলো সরু সরু, পায়ের আঙ্গুল বেঁকে গেছে, নেশাখোরের মত ঢুলু ঢুলু চোখ দুটি, কোমরের কাপড় নেই বল্লেই চলে, এই কি মা দুর্গার মূর্ত্তি নাকি? জানেন চণ্ডীতে কি বলে?

চণ্ডীতে যে কি বলে তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া অলক তাড়াতাড়ি সুবর্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আগের ঘরে চলিয়া গেল। কিছুদুর যাইতেই অলক দেখিল সুবর্ণ বিশেষ শ্রান্ত হইয়া এক পাশে বসিয়া পড়িয়াছে।

অলক নিঃশব্দে তাহার পাশে বসিয়া পড়িল, তারপর সান্ত্বনার ভঙ্গীতে কহিল—ছবি ভালো লাগ্‌ছে না এ কথা বলোনি কেন?

সুবর্ণ বিশ্রান্ত ভঙ্গীতে বলিল—ছবি হয়ত ভালোই, কিন্তু নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গৃহকর্ত্তা যেমন আপ্যায়ন কর্‌বার জন্যে যত রাজ্যর মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য পাতে সাজিয়ে দিয়ে আতিথেয়তার অত্যাচারে অতিথিকে পীড়িত কোরে তোলেন, তেমনই একসঙ্গে যেমন-তেমন ভাবে ভালো মন্দ হাজার রকম ছবি টাঙিয়ে দর্শককে যে আনন্দের চেয়ে পীড়ন করা হয় বেশী, এ কথা কে বল্‌বে?

অলক একবার মর্ম্ম বুঝিল, কহিল, আমি তোমাকে একটা লিষ্ট্ করে দেব কোন্ কোন্ ছবি দেখ্‌তে হবে, তাহ'লে তোমার পরিশ্রম অনেক কম্‌বে। তবে সেদিনও যেন এমনি ক্লান্ত হয়ে পড়ো না—

সুবর্ণ প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না, সত্যি দু'চারখানা ছবি বেশ ভালোই লেগেছে। তুমি যদি আমাকে একটা দুটো কিংবা তিনটি ছবি দেখাতে সবগুলিই হয়ত আমার ভালো লাগ্‌ত, কিন্তু এই হাজার হাজার ছবির মধ্যে কে বেশী সুন্দর তা বিচার করার মতো শাস্তি আর নেই।

অলক উচৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, কহিল—এই যদি তুমি ধারণা করে থাক' তাহ'লে আর কিছু শেখবার নেই, এই ঢের, তুমি জানো সুবর্ণ অনেকে ক্যাটালগ্‌ মুখস্ত করে সমাজে আপ-টু-ডেট্‌ বলে সাধারণের সম্ভ্রম কুড়িয়ে বেড়ায়—

সুবর্ণ আহত ভঙ্গীতে বলিল—আমি বুঝি ক্যাটালগ্‌ মুখস্ত করে লোকের সম্ভ্রম কুড়িয়ে বেড়াই!

অলক হাসিয়া বলিল—আবার চটে গেলে, আমি কি আর তোমাকই বলেছি! ফ্যাসানেব্‌ল্‌ সোসাইটির এমনই হালচাল। তা তোমার ফরাসী-শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হোল?

—Not too bad—

—Not too badly, please; অলক সংশোধন করিল।

সুবর্ণ লজ্জিত হইয়া কহিল, তুমি বড় কড়া লোক—

অলক গম্ভীর ভাবে বলিল—তার কারণ কি জানো, আমি মোটেই ভুল কর্‌তে চাই না। চাই গোড়া বেঁধে কাজ কর্‌তে, সমাজে চল্‌তে হলে যেটুকু দরকার সেইটুকু শেখাবারই ব্যবস্থা করেছি,—তারপর একটু থামিয়া গলার স্বর নীচু করিয়া অলক বলিল—এখন যদি বলি—ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে, তাহ'লে কি তোমার রাগ হবে সুবর্ণ?

ব্রীড়াকুণ্ঠ-ভঙ্গীতে সুবর্ণ কহিল—বারে, রাগ কর্‌বো কেন?

অলক বলিল—এই উত্তরই চেয়েছিলুম, এখন চলো ওঠা যাক্‌, এদেরও বোধ হয় দরজা বন্ধ করার সময় হোল।

বাড়ী ফিরিবার পথে ট্যাক্সিতে উঠিয়া অলক ও সুবর্ণ কেহই একটিও কথা কহিল না। অলক নিঃশব্দে বসিয়া সুবর্ণকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। সুবর্ণর মুখ হইতে একদিন সংক্ষিপ্ত "না" কথাটুকু শুনিয়া হয়ত আহত হইতে হইবে এই আশঙ্কায় অলক নিজেকে সতর্ক করিতে লাগিল, কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল বিবাহের প্রস্তাবে সুবর্ণ যদি সত্যই 'না' বলিয়া বসে, তাহা হইলে সে আঘাত সে কি করিয়া সহ্য করিবে! সুবর্ণকে বিবেচনা করিবার কোনো অবসর না দিয়া এখন হইতেই অসতর্ক মুহূর্ত্তের সুযোগ লইয়া জয় করিতে হইবে। এ চিন্তা কিন্তু অলক তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিল, সে আধুনিক এবং চপল বটে—কিন্তু তাহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ, সাধুতা। সুবর্ণকে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সে তাহার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছে, সে চায় আপন আত্মাকে সুবর্ণ খুঁজিয়া বাহির করুক, প্রয়োজন হইলে না হয় সে ইহার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করিবে।

এই সব চিন্তা করিতে করিতে সুবর্ণদের বাড়ীর দরজায় ট্যাক্সি আসিয়া থামিল। সুবর্ণ নামিয়া পড়িল, অলক কিন্তু তাহার সহিত নামিতে পারিল না। এতখানি সময় কাটাইবার ফলে তাহার অনেক কাজ জমিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই তাহার তাড়াতাড়ি ফেরা প্রয়োজন। বাহির হইতে সুবর্ণ দেখিল শুধু জহর ছাড়া বাড়ীর আর সকলেই ড্রয়িং-রুমে উপস্থিত। কুঞ্জ একধারে দাঁড়াইয়া উত্তেজিত ভঙ্গীতে হাত মুখ নাড়িয়া বকিতেছে।

বিশেষ কিছু একটা ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু অনীতা বা নন্দরাণীর মুখভঙ্গী দেখিয়া সুবর্ণ বুঝিল ব্যাপারটা তেমন গুরুতর নয়। নন্দরাণী তাচ্ছিল্যভরে হাসিতেছে, তাহার মুখে রহস্যের ভাব পরিস্ফুট, আর অনীতা তাহার হ্যাণ্ডব্যাগটা শূন্যে ছুঁড়িয়া লুফিতেছে, তাহার প্রসাধন-পারিপাট্য দেখিয়া বোঝা গেল সে এইমাত্র বাড়ী ফিরিয়াছে।

সুবর্ণ ঘরে ঢুকতেই কুঞ্জ ঝাঁঝালো গলায় বলিল—সুবর্ণ বুঝবে, সুবীর তবু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে—

সুবর্ণ নন্দরাণী ও অনীতার মুখের দিকে চাহিল, তারপর কুঞ্জর কাছে গিয়া কহিল—কি হযেছে বাবা? আবার কি নতুন গণ্ডগোল হোল?

কুঞ্জ তীব্রকণ্ঠে কহিল—গণ্ডগোল? বেশ গুরুতর গণ্ডগোল—

অনীতা প্রসঙ্গতঃ বলিয়া উঠিল—টাকাকড়ির ব্যাপারে অমন গণ্ডগোল হযেই থাকে।

অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার সহিত কুঞ্জ চীৎকার করিয়া অনীতাকে বলিল—তুমি চুপ করে থাকো, হাত খরচ করবার মতো টাকা পেলেই খুসী, টাকা যে কোথা থেকে আসে—সে খোঁজ রাখো!

অনীতা লঘুভাবে বলিল—টাকা কে না ভালোবাসে, তবে তা নিয়ে এত হৈ চৈ করার কি আছে জানি না। দিদিমণির বুদ্ধি-শুদ্ধি ভালো, ও হযত একটা তবু মানে করতে পারবে।

অনীতার কথাগুলিতে যে শ্লেষ ছিল নন্দরাণী তাহাতে বিরক্ত হইয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু কোনো মন্তব্য করিল না।

সুবর্ণ আবার কহিল—কি হয়েছে বাবা?

কুঞ্জ বলিল—কি আবার হবে মা, কেলেঙ্কারী, কেলেঙ্কারী! এখন অলকবাবুর আফিসে গিযেছিলুম, তাঁর অফিসের বড়বাবু কি বল্লেন জানো?

সুবর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল—অলকবাবু কি করেছেন বাবা?

কুঞ্জ বলিল—না অলকবাবু কিছু করেন নি, গভর্ণমেণ্টের কারসাজি সব। সব চোর, বুঝলে সুবর্ণ, সব বেটা চোর, সবাই কাঁচি নিয়ে বসে আছে, পকেটে কিছু দেখেছে কি নিবেছে, আমাদের উইলের প্রবেট নিতে কত খরচা হযেছে জানো? প্রায় দশ হাজার টাকার ওপর, গভর্ণমেণ্টই ত' অর্দ্ধেক নিয়ে নিলে, কি আর রইল তবে?

সুবর্ণ বলিল—এখানে প্রবেট, বিলেতে ডেথ্ ডিউটি!

কুঞ্জ সজোরে কহিল—প্রবেট না হাতী! পকেট কাটার ইংরাজী নাম! তারপর শোনো আরো আছে, এর ওপর আবার বছর বছর ইন্‌কাম ট্যাক্স আছে। তার চেয়ে সবই নিয়ে নে'না বাপু! কালই আমি খবরের কাগজে একটা চিঠি লিখে দেব—

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল—তা হ'লেই ষোলো আনা হবে, পুলিশে এসে হাতে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে যাবে!

কুঞ্জ একথায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল, এমন জান্‌লে আমি কখনই কিন্তু মোটর কিন্‌তুম না। এদিকে আবার জহর অতগুলো টাকা নিলে—কোত্থেকে যে এত আসবে জানি না।

অনীতা বলিয়া উঠিল—আমি ত' তোমাকে বলেছিলুম বাবা একটা জামা-কাপড়ের দোকান করতে—নতুন ডিজাইনের সাড়ি, ব্লাউজ, চালাতুম, দুদিনে হাজার হাজার টাকা লাভ হোত, দাদার গ্যাস্ কোম্পানীর চেয়ে, লাখো গুণে ভালো।

কুঞ্জ তৎক্ষণাৎ বলিল—সব কথাতেই কথা কওয়া তোমার ভারী বদ্ অভ্যাস্।

অনীতা বলিল—কি আর বলেছি বাপু, হাজার হাজার টাকা হোতই ত'!

নন্দরাণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—অনী চুপ কর!

কুঞ্জ এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল—চুপ কর, সারাদিন ঘুরে ঘুরে গলা শুকিয়ে গেল—এই বলিয়া কুঞ্জ সজোরে কলিং বেল টিপিল, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বিরক্ত হইয়া কুঞ্জ আবার বেল টিপিতে গেল, তখন নন্দরাণী গম্ভীর গলায় বলিল—বেল টিপে কোনো লাভ নেই—

কুঞ্জ বিস্মিত হইয়া বলিল—কেন? বেশত' আওয়াজ হচ্চে? খারাপ হয়নি ত'!

নন্দরাণী বলিল—কি চাই বলো আমিই এনে দিচ্ছি!

কুঞ্জ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া কহিল—তুমি কেন? বাড়ি বোঝাই চাকর বাকর রয়েছে কি মুখ দেখাবার জন্যে?

নন্দরাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হতাশভাবে অবশেষে বলিল—আর চাকর বাকরে বাড়ি বোঝাই নেই, বাড়ী খালি—

—কি? চলে গেছে…! সব এক সঙ্গে? ব্যাপার কি? বিস্মিত কুঞ্জ প্রশ্ন করিল।

নন্দরাণী মাথা নাড়িল, অনীতা বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিল—তবে আর কি, চলো সবাই গিয়ে হোটেলে উঠি, আর ঘর সংসারের কাজ কর্‌তে পার্‌বো না বাপু—

সুবর্ণ বলিল—কি হয়েছিল মা? হঠাৎ যে সব একসঙ্গে চলে গেল?

নন্দরাণী সোজাসুজি বলিল—ঠাকুরের সঙ্গে বিকেলবেলা কথা-কাটাকাটি হোল, তারপর যে কি হোল মা জানি না, সবাই দেখি কখন একে একে সরে পড়েছে। পরশু মাইনে পেয়েছে সেদিক থেকে ত' কোনো গোল নেই, বোধ হয় কোথাও বেশী মাইনের চাকরী জুটিয়ে থাক্‌বে—

কুঞ্জ এতক্ষণ পিপাসায় কাতর হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই সব গোলমালে সব ভুলিয়া বিশেষ উত্তেজিত ভাবে সারা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তারপর নিঃশব্দে বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ-পরে বিশেষ ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া কুঞ্জ বলিল—একখানা প্রকাণ্ড মোটর এসে দাঁড়ালো, কাদের বলোত'?

অনীতা তৎক্ষণাৎ প্রায় লাফাইয়া বারান্দায় দেখিতে গেল যে কাহারা আসিয়াছে। তারপর প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা, ওঁরা যে আমাদের এখানেই আস্‌ছেন দেখছি—

এ বাড়ীর ইতিহাসে ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একমাত্র অলক ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো অতিথি এ বাড়ীতে এখনও পদার্পন করেন নাই, তাহারা কতকটা যেন সমাজচ্যুত হইয়াই সহরে বাস করিতেছে, আজ সহসা কাহারা তাহদের স্মরণ করিল, কে জানে?

কুঞ্জ একটি তথ্য আবিষ্কার করিয়া কহিল—একজন বেশ মোটা সোটা মেয়ে মানুষ, একটি রোগা মেয়ে আর একটি ভদ্রলোক, তিনটি প্রাণী। কি ব্যাপার বলোত' বউ?

নন্দরাণী বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন না করিয়া চুপ করিয়া বসিযা রহিল।

কুঞ্জ বলিল—আজকের দিনেই চাকর-বাকর বিদেয় করে দিলে, এখন কি করে যে মুখ দেখাব জানি না।

অনীতা করুণ কণ্ঠে প্রায় কান্নার ভঙ্গীতেই বলিল—কেন চাকরদের তাড়ালে মা? এখন কে দরজা খুলে দেবে বলো ত'?

নন্দরাণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তুমি গিয়ে দরজা খুলে দাও, যদি ওঁরা ভদ্রলোক হ'ন ত' চাকর-বাকরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, ভাববেন, তুমি বুঝি ওখানে দাঁড়িয়েছিলে ওঁদের দেখে দরজা খুলে দিলে।

অনীতা কান্নার সুরে বলিল—আমার কান্না পাচ্ছে মা! আমি যেতে পারবো না।

নন্দরাণী দৃঢ়ভাবে বলিল—যাও, যা বল্লুম তাই করো শীগ্‌গির—

মিনিট দুই পরে অনীতা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—মা, ওঁরা লোকনাথ মজুমদারের স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে—চাকরটা বল্লে—

—কি? কার স্ত্রী? সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করিল.।

অনীতা তেমনই তাড়াতাড়ি বলিল—লোকনাথ মজুমদারের স্ত্রী,—

উত্তরা দেবী। ওঁরা সিঁড়ির ওপর প্রায় এসে পড়েছেন, আমি তোমাদের খবর দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি দৌড়ে এলুম—

১২

যে আতঙ্কিত অস্পষ্টতার ভীতিজনক আবহাওয়ায় ডেন্‌টিষ্টের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষমাণ রোগীরা বসিযা থাকে, অনাগত অতিথির আগমন প্রতীক্ষায় কযেকটি মুহূর্ত্ত সেই ভাবেই নিঃশব্দে কাটিবার পর, অনীতা, লোকনাথবাবুর স্ত্রী উত্তরা দেবী প্রভৃতি অতিথিদের লইযা ঘরে ঢুকিল। উত্তরা দেবীর বযস যৌবনের প্রান্তসীমা অতিক্রম করিলেও, তিনি বন্যা-স্রোতের মতোই উৎসাহ-উচ্ছল। সেই অনুপাতে তাঁহার ছেলে-মেয়ে দু'টির স্বাস্থ্যহীন নিস্প্রভ শরীর বিসদৃশ ঠেকে। বহুমূল্য পোষাকে যথেষ্ট সাজিয়া আসিলেও, ইহাদের যেন যাত্রাদলের সঙের মতো দেখাইতেছে। উত্তরা দেবীর সাজসজ্জা ও ভঙ্গিমা সকলকেই হার মানাইয়াছে। তাঁহার বিকুঞ্চিত মুখের কর্কশ কাঠিন্য ভেদ করিযা পাউডার-প্রলেপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে বৈধব্যের শুচি শুভ্র পরিধেয় যথেষ্ট কৌশলের সহিত উড়াইয়া দিলেও, অন্তরের বিলাস-ব্যাকুলতার ছাপ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিযা রহিয়াছে। সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার একটা আবরণ আয়ত্ত করা হইযাছে বটে, তাহাতে চরিত্রের কৃত্রিমতা ঢাকা পড়ে নাই।

সহরের সভ্যতা কুঞ্জ অনেকটা আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছে। উত্তরা দেবীর আবির্ভাবে সে বিস্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কি যে বলা উচিত হইবে আর কি বলা চলিবে না, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, মৌন থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়া রহিল।

উত্তরা দেবীর ছেলে-মেয়েরা অবজ্ঞাভরে সারা ঘরখানির খুঁটিনাটি-

লক্ষ্য করিতে লাগিল। মা যে তাহাদের জোর করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছেন, তাহা তাহাদের উদ্ধত ভঙ্গীতেই পরিস্ফুট।

আত্ম-পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে উত্তরা দেবী নন্দরাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আমাকে আপনারা চিন্‌তে পারছেন না বোধ হয়! আগে ত' আর দেখা হয় নি কখনও—

নন্দরাণী শূন্যদৃষ্টিতে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কুঞ্জ এতক্ষণে সৌজন্যভরে বলিল—আমাদের সৌভাগ্য। আপনার পায়ের ধূলো পড়্‌ল, অনী, সুবর্ণ—ইনি লোকনাথবাবুর স্ত্রী—

অনীতা ও সুবর্ণ নম্রভাবে নমস্কার জানাইল। উত্তরা দেবী প্রসন্ন হাসিতে তাহাদের অভিবাদনের উত্তরে বলিলেন—মেয়ে দু'টি ভারী সুন্দর—তারপর সহসা অনীতার একটি হাত তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—চমৎকার রঙ ত' তোমার, মেয়েদের গায়ের রঙটাই আসল, এর চেয়ে দামী আর কিছু নেই। কি করে এমন হোল? কি মাখো গায়ে?

অনীতা তুষ্ট হইয়া কহিল—কি জানি, কিছুই ত' করি না, তেমন—

উত্তরা দেবী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন—সে ত' ভাল নয় মা, তাই না আইলিন? স্কীন্ ঠিক্ রাখতে যে অনেক হাঙ্গামা—এই পর্য্যন্ত বলিয়া উত্তরা দেবী বলিলেন,—এটি আমার মেয়ে অনিলা, আইলিন বলেই ডাকি। আর দীপক আমার ছোট ছেলে, পার্ক ষ্ট্রীটে সিটি ফার্ণিসার্স বলে একটা ফার্ম্ম খুলেছে। ছোটবেলায় থেকেই ডেক্‌রেশনের দিকে ঝোঁক—

এই পরিচয়ের পরেও আইলিন ও দীপক তেমনই কঠিন ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল।

নন্দরাণী এইবার অতিথিদের অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—আপনারা বসুন, সেই থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—

উত্তরা দেবী বসিতে বসিতে বলিলেন—থ্যাঙ্ক্ ইউ, থ্যাঙ্ক্ ইউ, চমৎকার ঘরটি ত'—চার্ম্মিং রুম। তা ঐ যা বলছিলুম, বিউটি—মানে

রূপ-সৌন্দর্য্য, এ সব বজায় রাখ্‌তে হ'লে মাদাম রিপি কিম্বা ধরো মীর্ণা সেলোন এসব জায়গায় মাঝে মাঝে যাওয়া দরকার। আমাদের সময়ে এসব সুযোগ তেমন ছিল না। তারপর নন্দরাণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন —এ পাড়ায় বাসা করলেন কেন? কাছাকাছি ত' জানাশোনা কেউ নেই! আমি যখন শুনলুম এ বাড়ীর নাম প্যালেস্ গেট্, তখনই বুঝেছি যে এই দিকে হবে।

নন্দরাণী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিল—এ অঞ্চলটাই আমার পছন্দ।

উত্তরা দেবী অসহায় মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—আহা, কে জানে, আগে জান্‌লে আমরাই ভালো বাড়ী ঠিক করে দিতুম। সে বাড়ীটা কোথায় দীপক, সেই যে বেণ্টুরা বলছিল সেদিন?

দীপক গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—পাম এ্যাভিন্যুতে—শশাঙ্ক হাজরার বাড়ী, সে বাড়ী ভাড়া হয়ে গেছে এত দিনে।

কুঞ্জ বলিল—সে ত' পার্ক সার্কাসের দিকে—

উত্তরা দেবী বলিলেন—ঠিক্ বলেছেন, ওই দিকেই। আজকাল সবাই ওই দিকেই থাকেন কিনা, ভারী সুন্দর জায়গা, সুবিধেও অনেক—

কুঞ্জ শুধু বলিল—তা' হবে।

দাসী-চাকরদের ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে নন্দরাণী সত্যই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, তাই অতিথিদের যথাযোগ্য সমাদর করিতে পারিতেছে না। তথাপি নন্দরাণী বলিল—আপনাকে আজ ছাড়ছি না, বসুন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। এই ত' সবে সাতটা—

উত্তরা দেবী বিশেষ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—না, না, ও সব হাঙ্গামা করবেন না, সে আর এক দিন হবে'খন। এখনই একবার মার্কেটে যেতে হবে। সাতটা বেজে গেছে, মার্কেট থেকে ফিরতেই আটটা সাড়ে-আটটা হয়ে যাবে। ডিনার টাইমে বাড়ী ফিরতে পারবো না। তা' ছাড়া পথে আবার একবার থাম্‌তে হবে। কোথায় রে আইলিন?

আইলিন বলিল—নিতাই পাক্‌ড়াশী, তোমার কিছুই মনে থাকে না, মা!

উত্তরা দেবী বলিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিতাই পাকড়াশী। গ্রামোফোন, রেডিয়ো এ সব ত' তারই একচেটে আজকাল, কাল আবার আইলিনের রেকর্ডিং আছে কি না, ওর রেকর্ড শোনাবো একদিন। বোধ হয় 'চামেলী ডাকিল চাঁদে'—গানটার কি নাম রে আইলিন?

আইলিন বিরক্ত হইয়া বলিল—তোমায় সব কথা আর মনে করিয়ে দিতে পারি না। গানের নাম শুনে কি হবে বলো?

উত্তরা দেবী বলিলেন—বাঃ, নামটা ত' জানা দরকার। নিতাই পাক্‌ড়াশীর সুর, এমন চমৎকার গলা। আপনার কি মনে হয়? ভারী মিঠে গলা নয়?

নন্দরাণী অকপটে স্বীকার করিল—আমি ত' তাঁর গান শুনিনি—

উত্তরা দেবী বলিলেন—ও, একদিন শোনাবো। ওই সেই মালতী বোস্‌কে বিয়ে করেই কেমন এক রকম হযে গেছে। কি দরকার ছিল ওর বিয়ে করার বলুন?

এ কথার কি যে উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া নন্দরাণী কহিল—নিতাইবাবু বুঝি বিযে করেছেন?

উত্তরা দেবী বলিলেন—সে এক কাণ্ড, লম্বা ইতিহাস, পরে একদিন সব বল্‌বো। আমাদের প্যার্টি তাহ'লে কি বার হবে আইলিন?

আইলিন বলিল—বুধবার, সাড়ে ছ'টায়—

উত্তরা দেবী প্রতিধ্বনি করিলেন—বুধবার সাড়ে ছ'টায়, আপনাদের সবাইকেই যেতে হবে, আরো সব অনেকে আসবেন।

নন্দরাণী আপত্তি জানাইয়া বলিল—সেদিন কিন্তু—

উত্তরা দেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন—সে সব হবে না, আপত্তি চল্‌বে না, যেতেই হবে সবাইকে। ছেলেরা সব যাবে। তরপর চারিদিকে

দেখিয়া বলিলেন, ভালো কথা মনে পড়েছে। আর একটি ছেলে আছে না আপনাদের? তাঁকে ত' দেখছি না?

অপ্রতিভ নন্দরাণী বলিল—জহরের কথা বল্‌ছেন?

উত্তরা দেবীর কাছে এই নামটি যেন কতই পরিচিত। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, জহর, জহরকেও নিয়ে যাবেন কিন্তু—

নন্দরাণী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—সে ত' কখনো কোথায় যায় না!

উত্তরা দেবী বিশেষ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বলেন কি? কোথাও যায় না, তা'হলে করে কি?

নন্দরাণী বলিল—সে একটু লাজুক প্রকৃতির, তা, ছাড়া দিনরাত্তির তার কাজ নিয়েই ব্যস্ত। একটা কি গ্যাসের কারখানা কর্‌ছে কি না—

দীপক বিকৃত ভঙ্গীতে বলিল—What a strange occupation! গ্যাসের আবার কি কারখানা?

উত্তরা দেবী বলিলেন—সে একদিন আলাপ করে সব জানা যাবে। আইলিন চলো মা, আর এক মিনিটও সময়ও নেই। আচ্ছা আসি তা'হলে—নমস্কার—নমস্কার। বুধবার ছ'টায়। মনে থাকবে ত'?

দ্রুতগামী মোটরের তলায় সহসা চাপা পড়িলে পথিকের যেমন অবস্থা হয়, উত্তরা দেবীর তিরোধানের পর নন্দরাণীর সংসারের প্রাণী ক'টির অনেকটা তেমনই অবস্থা দাঁড়াইল। এই আগমন ও আমন্ত্রণ ব্যাপারে তাহাদের সংসারে একটা নতুন ভাঙন ধরিল। কুঞ্জ ও অনীতা একদিকে, আর একদিকে জহর ও নন্দরাণী, সুবর্ণ নিরপেক্ষ রহিল।

পরদিন জু'তে অলকের সহিত সুবর্ণ এ বিষয়ে আলোচনা করিল। অলক জু'তে বেড়াইতে ভালবাসে, একটু অবসর মিলিলেই সে আলিপুরে বেড়াইয়া যায়। সাপের ঘরে অদ্ভুত আবেষ্টনের মধ্যে সহসা সুবর্ণর উত্তরা

দেবীর কথা মনে পড়িল। সে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—এখানে এসে মিসেস মজুমদারের কথা মনে হচ্ছে—Just the feeling—

অলক এ মন্তব্যে সন্তুষ্ট হইয়া সুবর্ণকে বলিল—মাভৈঃ, তুমি এবার মানুষ হয়েছ, সারা জীবন মে ফেয়ারে কাটিয়েও অনেকে এ কথা বল্‌তে পারে না। You are coming on, আচ্ছা সুবর্ণ, বলো ত' মিসেস্ মজুমদার হঠাৎ তোমাদের নিমন্ত্রণ করে বস্‌লেন কেন?

—কৌতূহল।

—কৌতূহল ত' বটেই, জানো ওঁরা এমন লোক, যা কিছু খবরের কাগজের খ্যাতি অর্জ্জন করেছে তার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা কর্‌বেন, ফিল্ম্ ষ্টার, বক্সার, সন্ন্যাসী, হিন্দুমহাসভার লীডার সর্ব্ব বিষয়েই ওঁদের সমান আগ্রহ। তবে এ ক্ষেত্রে হয়ত আরো কারণ থাকতে পারে।

—আমারও ত' সেই রকমই সন্দেহ হয়।

—তোমাদের অর্থ সামার্থ্য ওঁদের জানা আছে, সেই কারণে ঘনিষ্ঠতা করাটাও আশ্চর্য্যের নয়, সেইটেই সম্ভব, উইলের ব্যাপার নিয়ে ওঁরা মাম্‌লা কর্‌তেন, বড় বড় ব্যারিষ্টারের কাছে তা নিরর্থক হবে শুনে চুপ করে গেছেন, এখন বোধ হয় ভেবেছেন অন্য কোনো উপায়ে ফাঁদে ফেল্‌বেন।

সুবর্ণ বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে অলকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ভয়ে ভয়ে বলিল—তাহ'লে বাবাকে কি যেতে বারণ কর্‌বো?

অলক হাসিয়া উঠিল,—কহিল—না, না, তা কোরো না, করে লাভও হবে না। তবে একটা কাজ কর্‌তে পারো, তোমার বাবাকে সতর্ক করে দিও। মিসেস মজুমদার যদি কয়লার খনির শেয়ার, কিংবা আয়রণ কর্পোরেশনের ডিরেক্টারীর কথা বলেন, তাহলে তিনি যেন দ্বিরুক্তি না করে পত্র পাঠ চলে আসেন।…And now let's have a look at these snakes.

শেষ মুহূর্ত্তে নন্দরাণীর আর পার্টিতে যাওয়া হইল না। কাহাকেও যখন বাধা দেওয়া গেল না তখন নন্দরাণী ঠিক করিয়াছিল মজা দেখিতে সেও যাইবে; কিন্তু অবশেষে অচেনা জায়গায় অজ্ঞাত পরিবেশের কথা মনে করিয়া নন্দরাণী জহরের সহিত বাড়ীতে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করিল। অনীতা মনে মনে ইহাই চাহিয়াছিল, মার অনুপস্থিতিতে তবু অনেকখানি স্বাধীনতা উপভোগ করা যাইবে।

উত্তরা দেবীর পার্টি সত্যই মহোৎসবে দাঁড়াইল। প্রতি মুহূর্ত্তেই সহরের ফ্যাসনেবল্ নরনারী দলে দলে আসিতে লাগিলেন, বিচিত্র বর্ণের সাড়ি, বিভিন্ন ধরণের গাড়ী, বিকৃত ঢঙের কথা। এই কৃত্রিমতায় সুবর্ণ আকুল হইয়া উঠিল। সে যে এই লীলামাধুরী উপভোগ করিতেছে না তাহা নয়, আগেকার কালে যাহা সে তীব্রভাবে অপছন্দ করিত এখন তাহাই সে পরম কৌতূহলভরে লক্ষ্য করিয়া মজা দেখিতে লাগিল। পুরুষের অসহায় দুর্ব্বল ভঙ্গিমা ও রমণীর কঙ্কালসার শ্রীহীন দেহ-বঙ্কিমা লক্ষ্য করিয়া সুবর্ণ কৌতুক বোধ করিল। উপস্থিত অভ্যাগতমণ্ডলীর আলাপের মধ্যে সুবর্ণ কয়েকটি মূল কথা আবিষ্কার করিল—অমুক রায় was tight last night, তমুক দে had a hangover to-day আর পরিচয় প্রদানের একটা প্রবল প্রতিযোগিতা। উত্তরা দেবী অন্ততঃ ত্রিশ জনের সঙ্গে সুবর্ণর পরিচয় করাইলেন। অপরিচিত কয়েকজন অভ্যাগতদের বাড়িতে সম্ভাব্য পার্টির নিমন্ত্রণ অযাচিতভাবে সুবর্ণর উপর বর্ষিত হইল। কয়েকটি ক্ষেত্রে সে নিমন্ত্রণ তাহাকে গ্রহণ করিতেও হইল। এতক্ষণ কি করিয়া এই সামাজিক শোভাযাত্রা সে উপভোগ করিতেছে তাহা ভাবিয়া সুবর্ণ নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল।

কুঞ্জর সারল্য, অনাড়ম্বর উক্তি এবং সহজাত সাধুতায় কয়েকজন আকৃষ্ট হইল। তাহা ব্যতীত উত্তরা দেবী বারবার বিশেষভাবে কুঞ্জর

সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখায় সম্মানিত অতিথি হিসাবে কুঞ্জ সকলের কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিল। অলক কুঞ্জকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, মাঝে মাঝে সে কথা মনে পড়ায় কথার মাঝখানেই কুঞ্জ থামিয়া পড়িয়া অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।

আর অনীতা—এ পার্টিতে আসিযা অবধি সে যেন চরকীর মতো এখানে সেখানে ঘুরিযা বেড়াইতেছে! ইতিমধ্যেই তাহার চারি পাশে তিন চার জন স্যুট্-পরিহিত শীর্ণদেহ ছোকরাব ভিড় জমিয়াছে। অনীতার বুদ্ধিহীনতায স্ুবর্ণ ব্যথিত হইলেও কিছু বলিল না। প্রকৃতিগত চাপল্য ও চঞ্চলতার গতি কে রোধ ব রিবে?

রাত্রি গভীর হইলেও পার্টির উত্তেজনা কমে নাই, সুবর্ণ কৌশল করিয়া কুঞ্জ ও অনীতাকে বাহির করিযা আনিল। তারপর কোনো ক্রমে মোটরের অরণ্য হইতে তাহাদের সদ্যক্রীত ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ গাড়িখানি খুঁজিয়া বাহির করিয়া সকলে উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জ হাই তুলিযা বলিল—অনেক রাত হযে গেল, না রে সুবর্ণ!

পথের আলোয রিষ্ট ওযাচ দেখিযা সুবর্ণ গম্ভীর গলায বলিল—পৌনে বারোটা। মা হযত রাগ করবে।

অনীতা বলিল—হযত কেন, নিশ্চযই রাগ করবে, কিন্তু মার অন্যায় রাগ, পার্টিতে এসে ত' আর অসভ্যতা করা চলে না। তাহলে না এলেই হ'ত!

সুবর্ণ বলিল—মিসেস মজুমদার কি বল্লেন বাবা?

কুঞ্জ হাসিয়া বলিল—কত কথা, আশ্চর্য্য! এত ভীড়ের ভেতরও কিন্তু কাজের কথা ভোলেন নি।

সুবর্ণ হাসিয়া বলিল—সেযারের কথা হোল নাকি?

কুঞ্জ বলিল—সেয়ার নয়, উনি একটা বাড়ি সস্তায় কিনিয়ে দিতে চান!

অনীতা বলিল—তুমি কি বল্লে বাবা? রাজী হয়েছ ত'?

কুঞ্জ অর্থসূচক ভঙ্গীতে হাসিয়া বলিল—আমার নাম কুঞ্জবিহারী, আমাকে ঠকাতে অনেক সময় লাগে। পাগল হয়েছ।

নব পরিচিত বন্ধুদের সম্পর্কে এই প্রকার অনুদার মন্তব্য প্রকাশ করায় অনীতা দুঃখিত হইয়া কহিল—মিসেস মজুমদার কিন্তু চমৎকার লোক বাবা। কত বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ, আমারই ত' চারটি পার্টিতে নেমন্তন্ন হোল—।

কুঞ্জ মৃদু হাসিযা সস্নেহ ভঙ্গীতে অনীতার পিঠে হাত বুলাইযা বলিল—পাগ্‌লী, তুই চিরদিনই একভাবে রইলি মা!

নিশীথ-নগরীর অখণ্ড নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করিযা জনবিরল পথে এই তিনটি প্রাণীকে লইযা মোটর ছুটিযা চলিল।

১৩

মিসেস মজুমদারের পার্টিতে যাহাদের সহিত পরিচয হইযাছিল কযেকদিনের মধ্যেই তাঁহারা ধারাবাহিক ভাবে পার্টি ও মজলিসে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে নিতাই পাকড়াশী, গগন হালদার, শশধর চৌধুরী প্রভৃতি বহু খ্যাত ও অখ্যাতনামাদের সহিত সুবর্ণ পরিচিত হইল। সব সময কুঞ্জ ও অনীতার সহিত সুবর্ণর যাওয়া হইয়া উঠিত না। অলকের সংস্পর্শে সে যে সমাজে মেলামেশা সুরু করিয়াছে, সে সমাজের সহিত ইহাদের কোনো মিল নাই।

এ সমাজ অপেক্ষাকৃত শান্ত, সংযত ও সংস্কৃত। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সাধারণতঃ যাহাদের নাম দেখা যায় সেই সব রাজনীতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, আইন-বিশারদ প্রভৃতি বুদ্ধিজীবিদের কেন্দ্র করিয়া এ সমাজ

গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া প্রথমটা সুবর্ণ দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ফ্যাসনেবল সমাজের কলরব হইতে এই শান্ত-আবেষ্টন যে সহস্রগুণে বরণীয় তাহা সুবর্ণ বুঝিয়াছে। এই সামাজিক সংস্পর্শে সুবর্ণ আরো মাধুর্য্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে।

তথাপি কুঞ্জ বা অনীতার সঙ্গ সুবর্ণ একেবারে ছাড়ে নাই, মাঝে মাঝে সে তাহাদের সহিত বেড়াইয়া আসে! এদিকে নাগরিক সভ্যতার চাপে পড়িয়া কিন্তু কুঞ্জ ক্রমশঃই শীর্ণ ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে, কখন কি নূতন বিপদ আসিয়া পড়িবে এই ভাবিয়া সে আকুল, তবে মিসেস মজুমদার বাড়ী কেনা বা কয়লার সেয়ারের কথা আর উত্থাপন করেন নাই, সুতরাং সেইদিক হইতে আসন্ন আশঙ্কার কোনো সম্ভাবনা নাই।

ইহা অপেক্ষাও গুরুতর সমস্যায় সুবর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পারিবারিক জীবনে যে বিরাট ব্যবধান দিন দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাহা সংযুক্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই। জহর গোড়া হইতেই ভিন্ন পথ ধরিয়াছে, এ সংসারে সে এখন অবলুপ্ত। কুঞ্জ ও অনীতা ফ্যাসনেবল্ সোসাইটির মাকড়সার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে, আর যে সমাজে সুবর্ণ মিশিয়াছে, অপর কেহ সেখানে বোধ করি স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস লইতেও পারিবে না। পরিবর্ত্তন হয় নাই শুধু নন্দরাণীর, এ সংসারে সে যেখানে ছিল সেখান হইতে একবিন্দুও সরিয়া যায় নাই, আপন আসনে আজো সে তেমনি প্রতিষ্ঠিত।

এই সময়ে অনীতার আব্দারে কুঞ্জ ঈষ্টারের ছুটিতে একটা পার্টির বন্দোবস্ত করিয়া বসিল! আর আর সব ব্যবস্থা সহজেই হইয়া গেল, কিন্তু নন্দরাণী বাড়ীতে এই সব হাঙ্গাম করিতে দিতে কিছুতেই রাজী নয়, অনেক বিতর্কের পর অবশ্য তাহাকে রাজী হইতে হইল। কুঞ্জ তলে তলে হিসাবপত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, নন্দরাণীর অনুমতি মিলিতেই সে আয়োজন করিয়া ফেলিল।

বাড়ীর সকলের আপত্তি সত্ত্বেও নন্দরাণী তাহার নব-পরিচিত বন্ধু সরকার-গিন্নীও রাণীর মা'কে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিল। সুবর্ণ মাকে বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল যে এ বিষয়ে সরকার—গিন্নীদের না ডাকিলেই ভালো হয়, কিন্তু সে কথায় কোন ফল হয় নাই।

সন্ধ্যার কিছু আগেই সরকার গিন্নী ও রাণীর মা আসিয়া হাজির, নন্দরাণী তাহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। কিছুক্ষণ মন্দ কাটিল না, কিন্তু একে একে যখন অন্যান্য নিমন্ত্রিতেরা আসিতে লাগিল তখন উহারা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সরকার-গিন্নী রাণীমাকে বলিলেন—বেশীক্ষণ থাকা চলবে না দিদি, এ যে দেখছি এলাহি কারখানা—রাণীর মা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন—আমাদের আসাই উচিত হয়নি। তারপর নন্দরাণী কাছে আসিতে উভয়েই গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন—আমরা আজ আসি ভাই—ভারী চমৎকার কাটল কিন্তু—

নন্দরাণী বুঝিল সব কাজেই কিছু বলিতে পারিল না।

সিঁড়ির ধারে সুবর্ণর সঙ্গে দেখা হইতে নন্দরাণী শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল—এই সব লোকেদের নেমন্তন্ন হযেছে নাকি?

সুবর্ণ বলিল—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, অন্ততঃ কিছু ত' বটেই, তা ছাড়া অনেককে আমি আগে কখনো দেখিনি মা, সব পার্টিতেই বোধ হয় এঁদের অবাধ গতি।

নন্দরাণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—তা'হলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, ঐ যে লম্বা লোকটি ঘুরে বেড়াচ্ছে ওকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল?

সুবর্ণ বলিল—উনিই ত' নিতাইবাবু, মানে নিতাই পাকড়াশী!

—এখান দিয়ে যখন গেলেন তখন এমন একটা বিশ্রী গন্ধ পেলুম, লোকটা কি রকম? মাতাল-টাতাল নাকি?

সুবর্ণ বলিল, আশ্চর্য্য নয়, আজকাল ওটা ফ্যাসান কিনা—

নন্দরাণী আর কিছু বলিল না, একটু উঠতেই দেখিল সামনের

হলঘরে অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে অনীতা লঘুপক্ষ চঞ্চল প্রজাপতির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! অনীতা বুঝিতে পারে নাই তাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে, নন্দরাণী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া তারপর অনীতাকে চুপি চুপি ডাকিয়া বলিল—বেশী বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু গলা টিপে ঘরে শুইয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেব, অমন বেহায়াপানা আমি দেখতে পারি না—

শেষ পর্য্যন্ত অনীতাকে কিন্তু বিছানায় শুইতে হয় না, সবার অলক্ষিতে নন্দরাণী অবশেষে চুপি চুপি নিজের ঘরে চলিয়া যায়। আজিকার এই উৎসব ও জন-কোলাহল তাহার সারা মনটিকে পরাজয়ের গ্লানিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল সে অতলে ডুবিয়া যাইতেছে, পার হইবার আর উপায় নাই, তাহারা সকলেই হয়ত ডুবিয়াই যাইবে।

ওপরে উঠিয়া নন্দরাণী দেখিল জহরের ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। একটু দাঁড়াইয়া নন্দরাণী বিশ্রান্ত ভঙ্গিতে জহরের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। নীচের কোলাহল এখানেও ভাসিয়া আসিতেছে। জহর টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। নন্দরাণীর পদধ্বনি শুনিয়া সে মাথা তুলিল, তারপর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল—কি হয়েছে মা তোমার, শরীরটা বুঝি ভাল নেই?

নন্দরাণী কহিল—না বাবা, আমার ত' কিছু হয়নি—

জহর বলিল—তুমি যে এক্ষুনি চলে এলে মা? ওঁরা হয়ত কিছু মনে করবেন?

নন্দরাণী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—আমি কাকেই বা চিনি জহর, তা ছাড়া আমরা সামান্য মানুষ, এ সব আমাদের ভালো লাগে না—

জহর বলিল—তুমি এসেছ ভালোই হোল মা, একটা কথা তোমায়

বল্‌বো মনে কর্‌ছিলুম, এখান থেকে রোজ সেই কাশীপুরে কারখানায় যাওয়া আসা করায় অনেক অসুবিধা আছে তা ছাড়া কারবারের দিক দিয়েও নিজে কাছে থাকলে ভালো হয়। নিরিবিলিতে কাজের সুবিধে।

নন্দরাণী উদ্‌ভ্রান্তের মত জহরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, আর এরকম হবে না জহর, আমি বেঁচে থাকতে নয়—

জহর ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না তা নয় মা, সে জন্যে নয়, কারখানার কাছে থাকলে সত্যি সুবিধে হয়, কখন কি দরকার পড়ে, বুঝ্‌লে মা ?

ইহার পর নন্দরাণী কি আর বলিবে, ইহা যে অবশ্যম্ভাবী তাহা সে জানিত, তবে এত শীঘ্র যে ইহা ঘটিবে তাহা অনুমান করিতে পারে নাই। নন্দরাণী কাতর কণ্ঠে কহিল,—তোর কারবারের যদি সুবিধে হয় তাহলে অবশ্য কিছু বলা যায় না, তবে প্রতি শনিবারে তোকে বাড়ী আস্‌তে হবে বাবা, নইলে আমি বাঁচবো না।

নন্দরাণী আর বলিতে পারিল না, অশ্রু তাহার কণ্ঠরোধ করিল।

জহর ব্যস্ত হইয়া কহিল—একটুতেই তুমি যদি ওরকম করো মা, তাহ'লে কি করি বল, আমি নিশ্চয়ই আস্‌বো, শনিবার কেন, সময় পেলেই আস্‌বো—

সময় আর সহজে মিলিবে কি না নন্দরাণী তাহাই ভাবিতে লাগিল।

গৃহকর্ত্রীর অভাব কিন্তু মোটেই অনুভূত হইল না, পার্টিতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সে কথা ভাবিবারও অবসর ছিল না। ভিড়ের মধ্যে নিজেদের সামলাতেই তাঁহারা ব্যস্ত। অনীতা অতিথি-সৎকারে এক বিন্দু ত্রুটি রাখে নাই।

অলকের প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ কাটাইয়া সুবর্ণ অবশেষে কুঞ্জকে খুঁজিতে লাগিল। নন্দরাণী যে সরিয়া গিয়াছে তাহা সে বুঝিয়াছিল,

কিন্তু কুঞ্জ গেল কোথায়! এক সঙ্গে গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী নিরুদ্দেশ হইলে অতিথিরাই বা কি ভাবিবেন! সুবর্ণ নীরবে চারিদিকে কুঞ্জকে খুঁজিতে লাগিল। অনীতা ও আর দু' একটি মেয়ে এক পাশে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছিল, সুবর্ণ একটু দাঁড়াইয়া যাহা শুনিল তাহাতে তাহার মুখের রঙ এক নিমেষেই শাদা হইয়া গেল, কে একজন অত্যন্ত স্থূল রসের গল্প করিতেছে, অনীতা প্রভৃতি তার প্রতি কথাতেই হাসিয়া উঠিতেছে। বেদনাহত সুবর্ণ এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে অনীতা ছেলেমানুষ, ও হয়ত মানে না বুঝিয়াই হাসিতেছে।

হলঘরের দরজার পাশে মিসেস্ মজুমদার নিতাই পাকড়াশীকে কি যেন বলিতেছিলেন, সুবর্ণ গমনোদ্যত মিসেস্ মজুমদারকে নমস্কার জানাইল, তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না, সুবর্ণ ভাবিল, তবু যাই হোক্ এইবার একে একে বিদাযের পালা সুরু হইল। কিন্তু কুঞ্জ কোথায, তাহার কি হইল, সুবর্ণ উপরে উঠিতে উঠিতে দেখিল সিঁড়ির পাশে অন্ধকারে কুঞ্জ বিবর্ণ পাংশু মুখে দাঁড়াইযা আছে। সুবর্ণকে দেখিয়া চুপি চুপি কহিল—পাপ বিদায হোল?

সুবর্ণ বলিল—কে বাবা? উত্তবা দেবী?

কপালের ঘাম মুছিযা কুঞ্জ কহিল, হ্যাঁ মা,—দেবী নয দানবী।

সুবর্ণ তাহার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিযা কহিল—এই গেলেন তিনি, কিন্তু কি হযেছে বাবা? ব্যাপার কি?

উত্তেজিত কুঞ্জ কহিল—জানো মা, এরা লোক ভালো নয। বল্লেন, কুঞ্জবাবু একটা প্রাইভেট্ কথা আছে, বলে আমায এই পাশের ঘরে নিযে এলেন। তারপর সোফায বসে আমাকে বল্লেন—বসুন না কুঞ্জবাবু, বসুন। ভয়ে ভয়ে বস্‌লুম, আর উনি কিনা স্বচ্ছন্দে আমার পাশে ঘেঁসে বস্‌লেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়া কুঞ্জ আবার কপালের ঘাম মুছিল।

সুবর্ণ বলিল—তারপর?

কুঞ্জ বলিল—তারপর আর কি? বলো ত' মা কেউ যদি এসব দেখত? কি সর্ব্বনাশটাই না হোত! আমাকে চুপি চুপি বলছেন কিনা ওঁকে 'বুলা' বলে ডাকতে হবে, 'তুমি' বলতে হবে। এমনি সব কত আবোল তাবোল কথা। বলো ত' মা এ কি ভাল কথা?

সুবর্ণ অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া কহিল—তারপর কি হোল বাবা? 'বুলা' বলে ডাকতে হোল?

কুঞ্জ গম্ভীর হইয়া কহিল—আমার নাম কুঞ্জবিহারী। বলে কিনা ওঁর সন্ধানে সব সস্তায় সেয়ার আছে, কিনলে লাভ হবে।

সুবর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল—সর্ব্বনাশ, কোনো কথা দাওনি ত' বাবা?

কুঞ্জ কহিল—হুঁ, লাভ-লোকসান, আমার লাভ-লোকসান আমি বুঝবো, উনি কে? বল্লুম আমি ও সব বুঝি না—

—তাতে উনি কি বললেন?

—বলবেন আর কি, একটু রাগ হোল বুঝলুম। আমাদের ভালোর জন্যেই নাকি একথা বল্লেন, নইলে কি দরকার ওঁর, আমি বল্লুম। আমাদের ভালো আমরা বুঝি—

—ঠিক বলেছ বাবা, বেশ করেছ। আর কিছু বল্লে নাকি?

—কেন বলবো না? বল্লুম, আপনাকে 'তুমিও' বলতে পারবো না' 'বুলাও' বলবো না, ওসব খারাপ শোনায়। এই কথা শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে বেয়ারাকে ডেকে বল্লেন, গাড়ী ঠিক করতে। আর কোন কথা হোল না,—বলো ত' মা কি সর্ব্বনেশে মানুষ এরা?

সুবর্ণ হাসিযা কহিল—এ দেশের নাম কলকাতা।

বারোটার পরও সুবর্ণ অলকের আশা ছাড়ে নাই। ম্লানমুখে এক একবার বাইরে যাইযা অলক আসিল কি না দেখিয়া আসিতেছে। ড্রয়িং রুমে ফিরিয়া সুবর্ণ দেখিল, তখনো দু'চারটি মেয়ে অর্দ্ধশায়িত

অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একজনও সুবর্ণর পরিচিত নয়।

অতিথিরা বিদায় হইলে তবু কিঞ্চিৎ নিরালায় থাকিতে পারা যায়, কিন্তু সে উপকারটুকুও করিবার ইচ্ছা ইহাদের নাই। নিরুপায় সুবর্ণ সেই অপরিচিতাদের মধ্যে নীরবে অতিথির মতো বসিয়া পড়িল।

পাশে ডিভানে একটি পরম লাবণ্যবতী মেয়ে মার্জ্জারীর মতো কুণ্ডলীকৃত হইয়া শুইয়াছিল। সুবর্ণকে দেখিয়া সে অলসকণ্ঠে বলিল—I'm just dying for a drink, কোন ব্যবস্থা করতে পারেন ?

সুবর্ণ এই রমণীয় তরুণীটিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া সবিনয়ে কহিল, কি চাই বলুন, আন্‌ছি।

মেয়েটি তেমনই অলস ভাবে বলিল—আমি যা চাই সে কি আপনি পারেন ? গলা ভেজাবার মতো যা হয় কিছু—

সুবর্ণ কোন উত্তর না দিয়া বয়কে একটা জিঞ্জার গ্লাস্ আনিতে বলিল। অপরিচিতা তরুণী বিন্দুমাত্র না নড়িয়া পা দু'টি সরাইয়া সুবর্ণকে সেইখানেই বসিতে ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করিল—আপনি এঁদের চেনেন ?

সুবর্ণ ঘরের চারিদিকে দেখিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িল।

মেয়েটি কহিল, না না এঁদের নয়। এই কুঞ্জবাবুদের, যাঁদের পার্টি ?

সুবর্ণ স্বীকার করিল যে সে কুঞ্জবাবুদের চেনে।

—কি রকম লোক এঁরা বলুন ত' ?

—খারাপ নয়, সাদাসিদে ভালো মানুষ !

—কেমন মজা দেখুন, how the wrong lot always get hold of the money.

সুবর্ণ একথার কোনো উত্তর না দিয়া বোধ করি অলকের আশায় দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে স্থবর্ণ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি চেনেন নাকি ?

—রামোঃ, আমি বিজন বড়ালের সঙ্গে এসেছি, আর্টিষ্ট বিজন, আমরা একসঙ্গেই থাকি কিনা—

ইহার উত্তর যে কি হইবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া স্থবর্ণ কহিল—ওঃ।

—হ্যাঁ, তবে don't think it's going to last, আপনি কার সঙ্গে এসেছেন ?

জিতেন গোঁসাই, চেনেন ? নামটি স্থবর্ণ আবিষ্কার করিল।

—না নাম শুনিনি, তাঁর সঙ্গে থাকেন নাকি, এন্‌গেজড্‌ ?

—না থাকি না, তা থাক্‌বো কেন ? স্থবর্ণ লজ্জিত হইয়া বলিল। বিস্মিত মেয়েটি কহিল—তাতে কি হয়েছে, যদি আপনাদের মধ্যে—

স্থবর্ণ বলিল—ভালোবাসার কথা বল্‌ছেন ?

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—Pity, ভালোবাসা টালোবাসা সেকেলে কথা, আমি বলছিলাম understanding কি রকম ?

অপ্রস্তুত স্থবর্ণ আবার একবার দরজার দিকে চাহিল।

মেয়েটি এইবার প্রশ্ন করিল—Looking for any one ? কাকে চাই ? জীতেন গাঙ্গুলী না কি বল্লেন ?

—না অলক চৌধুরীকে খুঁজছি, তাঁর আসবার কথা ছিল।

অখণ্ড উদাসীনতা ত্যাগ করিয়া মেয়েটি এতক্ষণে উঠিয়া বসিল, কহিল—অলক চৌধুরী, সলিসিটর ? চেনেন তাঁকে ?

স্থবর্ণ ভয়ে ভয়ে কহিল—হ্যাঁ, আপনিও তাঁকে চেনেন নাকি ?

মেয়েটি আবার অলস ভঙ্গীতে বলিল—চিনতুম বৈকি, বিজনের আগে I lived with him—

বিস্ময়াহত সুবর্ণ কহিল—অলক চৌধুরীর সঙ্গে ?

অবস্থায় মেয়েটি কহিল—আশ্চর্য্য হবার কি আছে, লোকটি ভালো,

সুব —কতদিন ছিলেন ?

—বছর দুই হবে, তারপর সুবর্ণর পরিবর্ত্তিত মুখভঙ্গী দেখিয়া শঙ্কাকুল হইয়া বলিল—Have I said anything I ought not to have ?

বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে সুবর্ণ বলিল—না না তা নয়, তবে আপনাদের বিচ্ছেদ—মানে when did you give him up ?

—তা প্রায় চার পাঁচ মাস হবে। আমি কিছুই বলিনি, নিজেই ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠ্‌ল, পরে শুনলাম বিয়ের ঠিক হয়েছে—

সেই মুহূর্ত্তে সুবর্ণর গৌর মুখখানিতে সারা দেহের রক্ত যেন উপছিয়া পড়িল। এই বিলাসিনীর রমনীয় তনুদেহ সে পারিলে তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়, এই মুহূর্ত্তে অলককে এখানে পাইলে সুবর্ণ তাহার মুখ হইতে বাকী কাহিনীটুকু শুনিতে পারিত, কিন্তু এখন সে কি করিবে—নিরালায় সকলের অলক্ষিতে নীরবে মরিতে পারিলেই হয়ত ভালো হয়।

মেয়েটি কিন্তু সুবর্ণর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মোটেই বোঝে নাই, সে বলিতে লাগিল—I threw a couple of scenes, কিন্তু অলকের কাছে তার মূল্য নেই, মনের ওপর ওর অসাধারণ control, আর আমিও জানতুম যে it would not last for ever,—

সুবর্ণ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত কখন নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়াছে মেয়েটি তাহা বুঝিতে পারে নাই, সুবর্ণ শুনিল, মেয়েটি বলিতেছে—Be an angle, and put my glass down for me—

এ অনুরোধ সুবর্ণ উপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যথা ও বেদনার তীব্র সংঘাতে ভিতরে পুড়িয়া মরিলেও আপনার অন্তর-বেদনা সুবর্ণ কাহাকেও জানাইল না। পার্টির দু' দশদিন পরে অলকের সহিত দেখা হইলে হয়ত সুবর্ণর এই হিমশীতল কাঠিন্যে সে বিস্ময় বোধ করিত। সুবর্ণ এই ক'দিন তাহার চারিপাশে এক অনধিগম্য পরিধি রচনা করিয়া দুঃখের দুঃসহ হোমানলে জ্বলিতে লাগিল।

এদিকে ব্যাপার এতখানি গুরুতর হইলেও অলক যে সুবর্ণর এতখানি মনোবেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সে জানিতে পারিল না। ধনী মক্কেলের কাজে দিল্লীতে এ কয়দিন তাহার নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

প্রথমটা সুবর্ণর প্রাক্তন রুক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ফিরিয়া আসিল, অলককে সে কখন আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে তাহা সে এই প্রথম বুঝিতে পারিল, তজ্জন্য তাহার মনে অনুশোচনার আর সীমা রহিল না। নিজেকে বার বার ধিক্কার দিয়া সে স্থির করিল যে তাহাদের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিবে, এমন কি যদি প্রয়োজন হয় বাক্যালাপ বন্ধ করিবে কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল এই অনমনীয় দৃঢ়তার একটু একটু করিয়া বিচ্যুতি ঘটিতে লাগিল।

এই ক'দিনে অনেকবার সেই পুরাতন অনাড়ম্বর জীবনের কথা সুবর্ণর মনে পড়িল, সেই সাধারণ জীবনে যদি আবার তাহারা ফিরিতে পারিত—সেই সীমাবদ্ধ পরিধি। অর্থব্যয়ে হয়ত আনন্দ আছে, নব-জীবন উদ্ভাবনায় হয়ত সার্থকতার উল্লাস আছে, কিন্তু হিসাব নিকাশ করিয়া দুই আর দুই-এ চার মিলাইতে যে প্রাণান্ত। এ দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তি কোথায়! পুরাতন ধারণাকে মিথ্যা বলিয়া মনে হইলেও তাহাকে ছাড়া যায় না, তাহার বেদনাও বড় কম নয়। বার বার সে অপরিতৃপ্ত

প্রাক্তন সুবর্ণে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, অতীতের সেই নিগূঢ় অন্ধকারে, সেই অন্তহীন গভীরতায়। শত্রুসঙ্কুল রণক্ষেত্রের নির্ভীক যোদ্ধার মতো আপন মনের সহিত অনেক সংগ্রাম করিল, কিন্তু এই সংঘাতের ফলে সে কয়েকটি বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করিয়া শিহরিয়া উঠিল। এ সে কি করিয়াছে, নিজের অজ্ঞাতসারে সে যে আপনাকে বিনিঃশেষে সমর্পন করিয়া বসিয়া আছে, অলকের সান্নিধ্যই এখন তার সর্ব্বপ্রধান কামনা। সুবর্ণর গোলাপী গাল দুটি এই সলজ্জ চিন্তায় রক্তাভা হইয়া উঠিল। অলকের অতীত তাহার এই কামনার আগুন নিভাইতে পারে নাই বরং অলককে আপন করিয়া পাওয়ার আকাঙ্খা আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। এই কথা ভাবিতেই সুবর্ণর মনে হইল তাহার মুখখানি আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে, সারাদেহের রক্তপ্রবাহ মুখে সঞ্চারিত, দেহে সে কি উত্তাপ! নারী হইলেও সুবর্ণের চরিত্রের দৃঢ়তা আছে, সে স্থির করিল যাহা সত্য ও অনস্বীকার্য্য, সাহসের সঙ্গে তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে, দ্বিধা ও লজ্জার কৃত্রিম ভাববিলাস চিরদিনের জন্য পরিহার করিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া সুবর্ণ স্থির করিল যে এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন রহিয়াছে এবার বোঝাপড়া অলকের দিক হইতেই হইবে। সুবর্ণর স্বকীয়তা আছে, তাহারও যে ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকিতে পারে অলককে এইবার তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। ঐ মেয়েটীর কাছে বিবাহের কথা বলিয়া অলক নিজেই অশান্তি ডাকিয়া আনিয়াছে।

এই দশ বারোদিন সুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নারীত্বের মহিমায় মহিমা মণ্ডিত অলক দিল্লী হইতে ফিরিয়াই সুবর্ণকে টেলিফোনে লাঞ্চের নিমন্ত্রন করিতে সুবর্ণ বিনা আপত্তিতে তাহা গ্রহণ করিল, তারপর অকারণে এখানে সেখানে ঘুরিয়া শ্রান্ত রুক্ষ দেহে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে হোটেলে গিয়া অপেক্ষমাণ অলকের সামনে বসিয়া পড়িল।

সুবর্ণর এই রুক্ষ শ্রীহীন চেহারা বা বিলম্বের জন্য অলক কিছু বলিল

না, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, সুবর্ণ ইহার অর্থ বুঝিল। তাহার রূঢ়তা যে অলক লক্ষ করিল তাহাতে সে খুশী হইল।

অলক একটু আহত স্বরে কহিল—পার্টি কি রকম জম্‌ল, একটা চিঠি লিখে জানাতে পারলে না? রোজই ভাবতুম তুমি কিছু লিখ্‌বে—

সুবর্ণ সংক্ষেপে কহিল—সময় কই? অনেক কাজ ছিল।

—চিঠি লেখারও সময় ছিল না, বলো কি?

—কত কাজ, একবিন্দুও সময় পেতুম না।

—কি কর্‌ছিলে, মানে কি এত কাজ ছিল?

—কাজ হিসাবে হয়ত তেমন কিছু নয়—

—হুঁ পার্টি কেমন হোল?

—ওঃ, চমৎকার—quite disastrous—

অলক হাসিল, তারপর সুবর্ণ এই কদিনে কি করিয়াছে, কি ঘটিযাছে তাহার একটি ধারাবাহিক বিবরণ বলিয়া গেল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সেই ডিভান-শায়িনী-তরুণী যাহা বলিয়াছিল সে কথা চাপিয়া গেল।

সমস্ত শুনিয়া অলক মাথা নাড়িয়া কহিল—ঠিকই হয়েছে, এ সব যে ঘট্‌বে তা আমি জান্‌তুম, কিন্তু এই সব গলাকাটাদের-সম্বন্ধে যদি এঁরা একটু সচেতন হয়ে থাকেন, তাহলেই মঙ্গল।

সুবর্ণ বলিল—মঙ্গল কি অমঙ্গল জানিনা, আর এখানেই যে শেষ তাই বা কি করে বলি!

সুবর্ণর মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া অলক ছুরি কাঁটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, দিল্লীতে I missed you like hell—

সুবর্ণ হাসিয়া বলিল—উৎসাহিত হলুম, অশেষ ধন্যবাদ।

—সুবর্ণ!

—কি?

—তুমি কি বোঝ না, আমি কি বল্‌তে চাই

—বুঝি !

—তাহলে আমাদের বিয়ের আর বাধা কি ? কিসের আপত্তি ?

—আপত্তি ? আপত্তি না থাকাটাই আশ্চর্য্য !

অলক এ উত্তরে হতাশ ভঙ্গীতে চেয়ারে হেলান দিয়া কিছুক্ষণ শিথিল ভাবে বসিয়া রহিল, তাড়াতাড়ি কফিটুকু শেষ করিয়া সুবর্ণর দিকে ফিরিয়া পুনরায় বলিল—বেশ, আমি তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছি তুমি প্রত্যাখান করলে—, Now we can talk sense, I want to be absolutely honest with you always—তবে কি জানো একটা জিনিস বুঝিনা, কোথায় সাধুতার শেষ আর কোথায় নির্বুদ্ধিতার সুরু, সীমা নির্দ্দেশ্‌ করা কঠিন।

সুবর্ণ বলিল—আমি কি বল্‌বো বলো ?

—পারবে না, পারা সম্ভব নয়। আমি জানি অতীত, অতীত-ই, কারো অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার কোন আধিকারই নেই, কারণ তা অতীত, আবার একথাও ভুল্‌তে পারি না যে কুঞ্জবাবুরা তোমাকে মানুষ করেছেন, আর যাই হোক, তোমার এই পালক পিতা-মাতাদের আভিজাত্যটাও তেমন গৌরবজনক নয়।

—এ তুমি কি বল্‌ছো ?

—বিয়ের কথাই বল্‌ছি, ভদ্রভাবে এটা ভাঙবার চেষ্টা করছি সুবর্ণ। অনেক সময় এ নিয়ে অনেক গোলোযোগের সূত্রপাত হয়, তাই সমস্তটা পরিষ্কার করে বলাই ভালো। আমার জগতে বিবাহে অনেক হাঙ্গাম, it leaves rather a long gap—

অলক ধীরে ধীরে একটি সিগারেট বাহির করিল। তাহার সাধুতায় সুবর্ণর কোন সন্দেহ ছিল না। অলক নির্ব্বোধ নয়, অদৃষ্ট হয়ত কিছু পরিমাণে প্রতিকূল, নতুবা দশ বারোদিন আগেও যে তাহাকে আত্ম-

সমর্পণ করিয়াছিল সে আজ সরিয়া যাইবে কেন? অলকের অপরাধ কি—সে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথই অবলম্বন করিয়াছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সুবর্ণর মতি পরিবর্তন অলকের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে বলিতে হইবে।

সাম্‌নে ঝুঁকিয়া সিগারেটটি ধরাইয়া দিবার সময় সুবর্ণ অলকের তীক্ষ্ণ সুস্পষ্ট চোখ দুটির দিকে চাহিয়া রহিল,—তারপর মসৃণ গলায় কহিল—you have filled up the gap nicely—

সুবর্ণর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া চঞ্চল ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া উঠিতে প্রজ্জ্বলিত দেশলাইযের কাঠিতে অলকের আঙুলে ছেঁকা লাগিযা গেল, সে ব্যস্ত হইয়া কহিল—এ সব কি বলছ সুবর্ণ, এর মানে?

—একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হোল, একালের মেয়ে।

অলক অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল, কহিল, কোথায় আলাপ হোল?

—পার্টিতে এসেছিল, সঙ্গে ছিল কে এক বিজনবাবু, তার সঙ্গেই নাকি সে এখন থাকে।

বিস্মযাহত অলক প্রায চীৎকার করিয়া কহিল—বলো কি! তার সঙ্গে থাকে, আর্টিষ্ট্ বিজন বড়াল?

—হ্যাঁ, বিজন বড়াল, আর্টিষ্টই বটে, লোকটা খরাপ নাকি?

—না ঠিক তা নয। খারাপ বা ভালোতে আমার আর কি, আমার সম্বন্ধে আর কি কি বল্লে?

—বিশেষ কিছু নয়, তবে শীগ্‌গীর নাকি তোমার বিয়ে হবে, তাই বিচ্ছেদ ঘটেছে—'।

সিগারেটটি সরোষে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অলক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—এই কথা বল্লে? Damn the little fool!

অসহিষ্ণু সুবর্ণ আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল—সত্যি তোমার বিয়ে হবে? একথা আমাকে কেন বলো নি?

বিলম্বিত-গতিতে একটি হাই তুলিয়া, ধীরে ধীরে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়া ঠোঁটে লিপষ্টিক্ ঘসিতে সুরু করিল।

অসহ্য। এতখানি নির্লজ্জ বেহায়াপনা সহ্য করা সহজ নয়। নন্দরাণী ঝাঁঝালো কণ্ঠে ডাকিল—অনী, শোন্ কি হচ্চিস্ দিন দিন?

এ প্রকার মন্তব্য অনীতার ভালো লাগিল না; সে কতকটা অবজ্ঞা-ভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মার মুখের দিকে চাহিল মাত্র, তারপর প্রসাধনের ছোটোখাটো ত্রুটিগুলি পূর্ব্ববৎ সংশোধন করিতে লাগিল। নন্দরাণীর সারা শরীর রাগে ও ঘৃণায় জ্বলিয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া অনীতাকে সজোরে টানিয়া তুলিয়া মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া কহিল—

কি ভেবেছ' তুমি? আমি জানতে চাই কি তুমি চাও? চুপ করে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এখন দেখছি তোমার মতো মেয়েকে এতখানি স্বাধীনতা দিয়ে মোটেই ভালো করিনি। একটি মিথ্যেকে ঢাকতে দশটি মিথ্যে তুমি বানিয়ে বলো, সত্যি কথা তোমার মুখে আসেনা— শেষ অবধি এতদূর যে গড়াবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, আমার কাছে মিথ্যে কথা?

অনীতা বিস্ময়বিমূঢ়কণ্ঠে বলিল—কি মিছে কথা? বারে, আমি আবার মিছে কথা কবে বলেছি?

—হ্যাঁ মিছে কথা, নির্জ্জলা মিছে কথা, মার মুখের সামনে মিছে কথা—লজ্জা নেই এতটুকু? কি যে করে বেড়াচ্ছ আমি কিছু জানিনা, না বুঝি না? বাড়ী থেকে বেরোও এর ওর নাম করে, আসলে যত সব ছন্নছাড়া বখাটেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও।

—ওঃ দিদি তোমায় বলেছে বুঝি! তোমার আদরের সুবর্ণ!

—বলতে কাউকে হয়নি, আমার চোখ আছে। আমারই ভুল, বাধা দিলে হয়ত কেলেঙ্কারী হয়ে দাঁড়াবে এই ভেবে প্রথমটা কিছু বলিনি। ভেবেছিলুম যা হয় কিছু লেখাপড়া শিখেছ, নিজের ভালোমন্দ বোঝার

ক্ষমতা হয়েছে, নিজের পথ বেছে নিতে পারবে, কিন্তু তা হ'বার নয়। জ্ঞান বুদ্ধি তোমার কোনো দিনই হবে না, কিছুই শিখলে না, নিজের জন্যে একটুও তোমার লজ্জা হয়না? চোখের সামনে জহর-স্বর্ণ ভাসছে, এ দেখেও যদি শিক্ষা না হয়—

অনীতা রাগে ভাঙিয়া পড়িল,—কহিল—ওঃ জহর-স্বর্ণ, ওরা ত' ভালো হবেই, গুণের ধবজা। এত সব সোনার চাঁদ, হীরের টুকরো, যখন কুড়িয়েই পেয়েছিলে তখন কি দরকার ছিলো তোমার নিজের ছেলে মেয়ের? আমি না হ'লেই ত বাঁচতে—যত খুসী এই সব বাপে খেদান, মায়ে তাড়ানোদের নিয়ে বাড়ী বোঝাই কর্‌লেই ত' পারতে।

তৎক্ষণাৎ নন্দরাণী সজোরে অনীতার সেই রুজ-পাউডার চর্চ্চিত কোমল গালে এক চড় মারিয়া বসিল। তারপর যাহা ঘটিয়া গেল তাহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরিশেষে নন্দরাণী ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। এই মুহূর্ত্তে যাহা ঘটিয়া গেল তাহার জন্য নন্দরাণীর লজ্জার আর সীমা রহিল না, এতো বড় মেয়েকে অবলীলাক্রমে সে কি করিয়া মারিয়া বসিল, তাহা সে নিজেই ভাবিয়া পায় না, অনুশোচনা ও বেদনায় তাহার অন্তর পুড়িয়া গেল। অনীতা তেমনি নিঃশব্দে জলভরা চোখে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর নন্দরাণী নানা আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল।

এই সময়ে স্বর্ণ কোথা হইতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহাকে দেখিয়া অনীতা চীৎকার করিয়া উঠিল,—এইবার সুখ উথ্‌লে উঠ্‌ল ত', তোমার আদরের স্বর্ণ এসেছেন,—

স্বর্ণ স্তম্ভিত হইয়া গেল, স্খলিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে ভাই অনী? ব্যাপার কি?

সুবর্ণর দিকে মুখ ফিরাইয়া অনীতা ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—খুব হয়েছে ঢং করে 'ভাই' বলে আর সোহাগ করতে হবে না, তোমার চালাকী এতদিনে বুঝেছি, অতো ন্যাকামীর কি দরকার ছিল, যা বল্‌বার তা সাম্‌নাসামনিই ত' বলতে পারতে? আমরা যদি এতই পর হয়ে থাকি, বন্ধু বান্ধবের ত' কম্‌তি নেই, আর কেন? আমাদের একটু নিরিবিলি ছেড়ে দিয়ে সেখানে উঠ্‌লেই ত' পারো।

নন্দরাণী পাগলের মতো চীৎকার করিযা কহিল—অনী, চুপ কর্ বল্‌ছি শীগ্‌গীর—

অনীতা তেমনই প্রখর হইযা বলিল—কেন চুপ করবো? তোমাদের সবাইকে চিনে নিযেছি। নামেই আমি তোমাদের মেযে, আমার ওপর তোমাদের মায়া ত' কত, কেবল যত রাজা মহারাজা-লাখ্‌পতিদের নিযেই আছো!—আমাকে তোমরা কেউ-ই ভালোবাসো না—একটুও না—একটুও না—

এই কথাগুলি বলিযা অনীতা কান্নায ভাঙিযা পড়িল, সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে সুবর্ণ ভালোমন্দ না বুঝিযাই তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিষ ঢালিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অনীতা বলিয়া উঠিল—ছাড়ো বলছি, ঢের হযেছে, তোমাকে চিনে নিযেছি—

অনীতা সজোরে দরজা বন্ধ করিযা চলিযা গেল।

সুবর্ণ ধীরে ধীরে নিস্পন্দ স্তব্ধতায নন্দরাণীর পাশে আসিয়া বসিল। তারপর শান্তকণ্ঠে কহিল—অনী বড্ড ক্ষেপে গেছে, তুমি যাও মা ওকে একটু শান্ত করে এসো।

নন্দরাণী মাথা নড়িয়া তাহার অক্ষমতা জানাইল, কিছুক্ষণ পরে কহিল—পরে যাবো, এখন আমি কিছুতেই ওর সাম্‌নে যেতে পারবো না।

নন্দরাণীর ব্যথা সুবর্ণ বুঝিল, তাই আর কোনো কথা না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে অবশেষে নন্দরাণী কহিল—এখন

দেখ্‌ছি সত্যি অন্য কোথাও যাওয়াই তোমার পক্ষে ভালো, সব দিক ভেবে দেখ্‌লুম যে এ ছাড়া আর উপায় নেই,—তারপর মাথাটি তুলিয়া ধীর ভাবে নন্দরাণী বলিতে লাগিল—সুবর্ণ, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, বুদ্ধি-বিবেচনায় অনীতা তোমার পায়ের তলায় দাঁড়াবারও যোগ্য নয়, সমাজে তোমার তাই আদর হয়েছে, শুধু রূপ থাক্‌লেই হয় না মা, গুণ একটু থাকা চাই। নম্রতা ও সহবৎ শিক্ষাও বড় জিনিষ, অনীতা সে সব কিছুই শিখ্‌লো না, আর সেই কারণেই তোমাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার কথা সে অমন করে বল্‌তে পার্‌লে, মাথায় কিছু নেই বলেই ওর এত স্পর্দ্ধা!

—তাতে আর কি হবে মা, তুমি চুপ কর, ছেলেমানুষ না বুঝে সুঝে বলে ফেলেছে। নন্দরাণী পায়ের নীচে কার্পেটের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল, তারপর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—সুবর্ণ, তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ, কিন্তু মা শুধু অনীর জন্যে বলিনি, এখন আমি অনেক ভেবে দেখ্‌লুম, তোমার জগৎ আলাদা, আমাদের সমাজ আলাদা, তোমাদের সমাজের মাঝে গিয়েই তোমাকে দাঁড়াতে হবে। তোমার সঙ্গে তাল ফেলে চল্‌তে আমরা পার্‌বো না, হাজার চেষ্টা কর্‌লেও পারবো না। পৃথিবীশুদ্ধ ফার্‌কোট্‌ আর গাড়ী গাড়ী সাড়ি পর্‌লেও নয়, বাক্স বাক্স ক্রীম মাখ্‌লেও নয়, আমরা চিরকাল সেই-ই থাক্‌বো, কয়লার রঙ্‌ কি কিছুতেই মোছা যায় মা? বক্সীরহাট আর তেজপুরের সমাজই আমাদের যোগ্য—আমরা এখানকার নই, হাজার চেষ্টা করলেও নয়।

উচ্ছ্বসিত আবেগে সুবর্ণ শুধু কহিল—এ কি বল্‌ছো মা!

তাহার সুন্দর চোখ দুটি অশ্রুভারে পদ্মপত্রের মত টল্‌ টল্‌ করিতে লাগিল। কতদিনের মান, অভিমান, কত ছোটখাট সুখ-দুঃখের কলহ, কত তুচ্ছ সংঘর্ষ ও দীপ্ত আনন্দের মুহূর্ত্ত, কত শান্তিহীন দিনের ক্লান্তিকর স্মৃতি, আজ এক নিমেষেই চরম সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অশ্রুসিক্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বরে নন্দরাণী কহিল—আমি তোমাদের মা নই, মা হ'বার অধিকার আমার কোথায় সুবর্ণ? কি করেছি আমি তোমাদের? পয়সার বিনিময়ে বাজারের আয়াদের মতো শুধু মানুষ করেছি মাত্র, এর কতটুকু কৃতিত্ব আমার? আমিও তোমাদের আয়া, তার বেশী কিছুর যোগ্য আমি নই। মা হওয়া হযত আরো কঠিন।

যে-অশ্রুধারা এতক্ষণ প্রাণপণ শক্তিতে সুবর্ণ রোধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহার বাঁধ ভাঙিল—তাহার সারা মুখখানি অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল, সহস্র চেষ্টা সত্বেও একটি কথাও সে বলিতে পারিল না।

তাহার এই উচ্ছ্বসিত আবেগে নন্দরাণী অন্তরে আকুল হইয়া উঠিলেও বাহিরে যথেষ্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করিযা কহিল—ছিঃ মা, অমন করে কাঁদলে কি করে কি হবে? কি করতে হবে না হবে সে সব ত' ভাবা দরকার! আশ্রয ত' একটা চাই।

চোখের জল মুছিযা সুবর্ণ কহিল—ওযাই ডাব্লু সিয়েতে আমার দু' চারজন বন্ধু আছে, সেখানেই উঠবো মা, তারপর—

সুবর্ণ নন্দরাণীর কোলে মাথা রাখিযা তাহার মনোভাব চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নন্দরাণী তাহার রেশম কোমল চুলগুলিতে সস্নেহে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে কহিল—আর একটা কথা আমি বল্‌বো সুবর্ণ, কোনো লজ্জা কোরো না, সোজা জবাব দাও, অলক কি তোমাকে বিয়ে করতে চায়?

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সুবর্ণ কহিল—অনেকবার আমাকে বিয়ের কথা বলেছেন!

—তুমি কি বলেছ? নন্দরাণী মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

সুবর্ণ সলজ্জ ভঙ্গিতে বলিল—আমি সোজাসুজি 'না' বলেছি।

উদ্বিগ্ন নন্দরাণী কহিল—কেন এ কথা বল্লে মা? এ কথার মানে?

সুবর্ণ এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

করুণা ও স্নেহে বিগলিত হইয়া নন্দরাণী কহিল—ছিঃ মা, মন যাকে চাইছে, শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাকে "না" বল্লে কি করে? আমি আর কি বল্‌বো, কিন্তু তোমাকে ত' বোঝাবার কিছু নেই।

সুবর্ণ কিছু বলিল না, সে তেমনই নিঃশব্দে নন্দরাণীর কোলে পড়িয়া রহিল। তাহার ঘন কুন্তলরাশি বুকে-পিঠে বর্ষণোদ্যত মেঘভারের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিস্রস্ত সাড়ির অন্তরালে সে আর আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না, তপশ্চারিণী পূজারিণীর নিষ্ঠায় অন্তর-দেবতার কাছে সে আপনাকে নিবেদন করিয়া ফেলিযাছে।

নিরুচ্চার নিবিড় অনুভূতিতে দুটী প্রাণী তেমনই ঘনীভূত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

১৬

এতদিনে তবু অনীতা কতকটা স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিতেছে। পদে পদে ছোট খাটো বিধি-নিষেধের গণ্ডিতে যাহারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহারা একে একে সরিযা গিয়াছে। সেই ঘটনার পর হইতে নন্দরাণী প্রয়োজন মত সামান্য কথাবার্ত্তা বলে মাত্র, সুতরাং অনীতার সকল দায়িত্ব এখন কুঞ্জর ঘাড়ে পড়িয়াছে।

এই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ সুযোগ অনীতা গ্রহণ করিল। যে-সান্নিধ্যের জন্য সে এতকাল ব্যাকুল ছিল, সৌখীন বাক্যচ্ছটার বন্যাস্রোতে লঘুচিত্ত অনীতা সহজেই ভাসিযা গেল। সিনেমা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, দক্ষিণেশ্বর হইতে সুরু করিয়া ফার্‌পো, ক্যাসানোভা, গ্রে-হাউণ্ড রেস্‌

কিছুই বাদ গেল না। সহচরের অভাব নাই, নিত্য নূতন প্রমোদ, উত্তেজনা ও উন্মাদনার চূড়ান্ত!

বেবী-টাইপের হাল্‌কা হাওয়া-গাড়িতে শহরের যে-তথাকথিত অভিজাত রোমান্স্‌-বুভুক্ষু সম্প্রদায় শিকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় অনীতা সহজেই তাহাদের প্রলোভনে ভুলিল। তাহারা মাঝে মাঝে বাড়িতেও আসা-যাওয়া করিতেছে। প্রথমটা পাহারা হিসাবে কুঞ্জ অনীতার সঙ্গ লইয়াছিল কিন্তু অপ্রতিভ কুঞ্জকে বাধ্য হইয়া সে জেদ ছাড়িতে হইয়াছে। অনীতার উপর কুঞ্জর বরাবরই একটা গভীর মমতা বর্ত্তমান, মূলতঃ তাহার প্রশয় পাইয়া অনীতা এতখানি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, অনীতার সকল প্রকার মিথ্যা ও কষ্ট-কল্পিত কাহিনী সর্ব্বদা বিশ্বাস না করিলেও, সে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইত।

অনীতার সহচরদের সততায় মাঝে মাঝে সন্দিহান হইলেও অনীতার মুখখানি দেখিলে কুঞ্জ তাহাকে তিরস্কার করিবার কথা ভুলিয়া যাইত।

এই উৎকট আধুনিকতাগ্রস্ত বিলাসী সমাজের সকল আচরণ অনীতা নিজেও সর্ব্বদা সমর্থন করিতে পারিত না, তবু আপত্তি করিত না। যে প্রতিযোগিতা! আপত্তি অমনি করিলেই হইল, অনীতার মতন হাজার মেয়ে এই সাহচর্য্যের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

তাহারা টেনিস্‌ খেলে, সুইমিং ক্লাবে হাঁসের মত সাঁতার কাটে, কেহ আবার ফ্লাইং ক্লাবে এরোপ্লেন চালানো শিখিতেছে। রূপে হয় ত তাহারা অনীতার পাশে দাঁড়াইতে পারিবে না কিন্তু ফ্যাসানের পরীক্ষায় তাহারাই ফুল মার্ক পাইবে, তাহারাই অভিজাত সম্প্রদায়ের আকর্ষণকেন্দ্র। এ ছাড়া আবার ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল মেয়ে আছে, ইংলিশে ফার্ষ্টক্লাস ফার্ষ্ট, ষ্টেটস্‌ম্যানে মাঝে মাঝে তাহাদের চুট্‌কী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যে কোনো বিষয় তাহাদের করায়ত্ত। অমন যে-সুবর্ণ চিরদিন অনীতা যাহাকে

অনুকম্পা করিয়া আসিয়াছে, যাহার অনাড়ম্বর সারল্যে বিস্ময়বোধ করিয়াছে, সেও সহরে আসিয়া এই ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল প্যাঁচে কিস্তিমাৎ করিয়া বসিয়াছে। অনীতা ইহার অন্তর্নিহিত মর্ম্ম বুঝিয়া পায় না।

তথাচ অপরে যে তাহাকে ডিঙাইয়া যাইবে তাহাও সহ্য করা যায় না, তাই বাধ্য হইয়াই তাহাকে পাল্লা দিয়া গতিবেগ বাড়াইতে হইয়াছে। তাই সে দ্রুত মোটর ড্রাইভে, সচকিত উপস্থিতিতে ও প্রসাধন ও পোষাকের পারিপাট্যে নিজেকে একটা আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিল। তাহাতে ফল যে বিশেষ লাভজনক হইল তাহা নয়, দেখা গেল এই উন্নাসিক অরণ্যের মধ্যে একমাত্র কুমার নিখিলনারায়ণের সহিত অনীতার একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। কুঞ্জর পার্টিতে যে ব্যক্তির অত্যন্ত স্থূল-রসিকতায় অনীতা প্রভৃতিকে সুবর্ণ হাসিতে দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিল, ইনি সেই নিখিলনারায়ণ! কুমারের ওপর অনীতার যে বিশেষ কোনো মোহ ছিল তাহা নয়, কিন্তু পটভূমিতে আর কাহাকেও পাওয়া গেল না বলিয়াই অনীতা এই কুমারবাহাদুরটিকে অবলম্বন করিয়াছিল।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা, দিনের দেবতা অস্তমিত হইলেও সহরে তখনও সন্ধ্যা ভালো করিয়া জমে নাই।

সাড়ে আটটার পর সিনেমা ভাঙিল—

কুমার বাহাদুর গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন—এর মধ্যে বাড়ি ফিরে কি করবে? তার চেয়ে একটু ফ্রেশ্‌ এয়ার, মন্দ কি?

অনীতা এ প্রস্তাবে কোনো আপত্তি করিল না।

কুমার বাহাদুরের মোটর ক্যাস্থুরিনা এ্যাভিন্যুর পথে ছুটিয়া চলিল। অনীতা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—এমন অসময়ে এ পথে কেন?

কুমার বাহাদুর এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অর্থসূচক ভঙ্গীতে একটু হাসিলেন মাত্র।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পশ্চিম দিকে এক জন-বিরল পথের প্রান্তে কুমার বাহাদুর গাড়ি পার্ক করিলেন।

গাড়ি থামিলে অনীতা রহস্য করিয়া বলিল—এই বুঝি তোমার ফ্রেশ্‌ এয়ার ?

তুচ্ছ ভালোবাসার কথায় বৃথা সময় নষ্ট করিবার ব্যক্তি কুমার বাহাদুর নন। তিনি সহসা সবল বাহুবেষ্টনে অনীতাকে বাঁধিয়া আবেগভরে চুম্বন করিয়া বসিলেন। ঠিক এই জাতীয় কোনো অতর্কিত আক্রমণের জন্য অনীতা প্রস্তুত ছিল না, কুমার বাহাদুরের এই আকস্মিক ঔদ্ধত্যে সে বিশেষ বিরক্ত হইলেও লজ্জায় কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার এই মৌনতা কুমার বাহাদুর সহযোগিতার সম্মতি বলিয়া মনে করিয়া আরো স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু, অপমানে, লজ্জায়, ঘৃণায় অনীতা ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই পশু-প্রকৃতির মানুষটির আদিম প্রবৃত্তির হাতে সে আত্ম-বলিদান দিতে পারিবে না। কুমার বাহাদুরের উত্তপ্ত বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে সংগ্রাম করিয়া সে তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে কহিল—ছেড়ে দাও শীগ্‌গীর, সব জিনিষের সীমা আছে, কি সাহস তোমার !

কে কার কথা শোনে ! অনীতার পরিচিত অন্যান্য তরুণদের মত কুমার বাহাদুর ততটা সৌজন্যশীল নন। তিনি জানেন বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, অত সহজেই ভীরুর মত ছাড়িয়া দিবার পাত্র তিনি নন। অবশেষে মুক্তি পাইবার জন্য মরিয়া হইয়া অনীতা কুমার বাহাদুরের হাতের কয়েকটি আঙুল দংশনে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল।

কুমার বাহাদুর বিশেষ বিরক্তিভরে অনীতাকে সজোরে দূরে ঠেলিয়া দিয়া সেই দংশনক্ষত আঙুলগুলি চুষিতে লাগিলেন। কয়েকটি বিশ্রী স্তব্ধ মুহূর্ত !

কিছুক্ষণ পরে কপালের স্বেদবিন্দু মুছিয়া শ্লেষভরে কুমার বাহাদুর কহিলেন—So sorry you've been troubled !

দৃঢ় দীপ্ত কণ্ঠে অনীতা আদেশ করিল—এখনই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো, তোমার সঙ্গে আর কখনো আমি ড্রাইভে বেরোবো না, কখনো না—

অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে কুমার কহিলেন—ভয় নেই, আর কেউ ডাকবে না। বাড়ী পৌছে দিবার কথা বল্‌ছো, দরকার থাকে হেঁটে যাও, কাছাকাছি বাস্ ধরতে পারো, আমি কেন পৌছে দেব?

বিস্মিত অনীতা ভীত অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—ও!

কুমার বাহাদুর একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন—কথাটা হয় ত কটু শোনাচ্ছে—but if you don't like driving with me—

অনীতার রাগ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল,—সে কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইয়া কহিল—You couldn't be so beastly!

ক্ষত আঙুলগুলি সযত্নে লক্ষ্য করিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন,—Oh, yes I could, এই যদি তোমার মনে ছিল why did you pretend you wanted it,

এই কথায় অনীতা আরো উত্তেজিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল—I never pretended anything.

—তাহ'লে তুমি বিনা দ্বিধায় এলে কি করে আমার সঙ্গে? বেড়ানোর মানে কি তুমি জানো না?

—বেড়ানো জানি কিন্তু তার অর্থ যে এতদূর বিশ্রী হ'তে পারে, তুমি যে এমন বর্ব্বর হয়ে উঠতে পারো, তা আমি কল্পনা কর্‌তে পারিনি।

পুনরায় উপেক্ষার ভঙ্গীতে অনীতাকে আঘাত করিয়া আভিজাত্য-কঠিন কণ্ঠে কুমার বাহাদুর বলিলেন—তুমি আমাদের একজন সেজে ঘুরে বেড়ালেও, তুমি যে কি তা জানি, আমার পরামর্শ নাও, দেশে ফিরে গিয়ে একটা বিয়ে থা করে আর পাঁচজনের মতো সংসার-ধর্ম্ম করো গে, কল্‌কাতা সবায়ের সয় না।

প্রতিবাদে প্রখর হইয়া বাষ্পাকুল নয়নে অনীতা কহিল—এই আমার দেশ, তোমার সঙ্গে কোথায় আমার প্রভেদ ?

—তর্কের প্রয়োজন নেই অনীতা। নিজের মন নিজে ঠিক কর, সময়মত কথাগুলো ভেবে দেখো, নিজের কথা না বলাই ভালো, তবে আমার মতো দু দশটা কুমার আর না জুটতেও পারে। চলো রাত হয়ে গেল, হেঁটে যাবার কথা ঠাট্টা করে বল্‌ছিলুম—

গাড়ীর আলো জ্বালিয়া ষ্টার্ট দিবার উদ্যোগ করিতে করিতে কুমার বাহাদুর নরম গলায় সস্নেহ ভঙ্গীতে বলিলেন—এমন সন্ধ্যেটা মাটি কর্‌লে অনীতা,

বাড়ি ফিরিবার পথে দীর্ঘ সময় অনীতা নীরবে বসিয়া রহিল। প্রাথমিক উত্তেজনার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, এখন সে বিহ্বল ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সব দিক দিয়াই কুমার বাহাদুরের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। অনীতার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হইবার নয়। অনীতা ক্ষমা করুক আর নাই করুক তাহার জন্য কুমার বাহাদুরের মনে এক বিন্দু অনুশোচনা বা লজ্জা নাই। অনীতা এই ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল, এরপর সত্যই যদি কুমার বাহাদুরের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটে তাহা হইলে যে আলোকোজ্জ্বল নগরীর আবহাওয়া আজো অনীতার কাছে স্বর্গের মতো রমণীয় সেই স্বর্গ হইতে বিদায় লইতে হইবে। সহরের সহস্র অনুভূতি, এই উষ্ণ আবেষ্টন, বিলাসের বর্ণচ্ছটা সমস্তই স্বপ্নের মত মুছিয়া যাইবে।

অনীতা কি করিবে ? ইহা যে প্রেম নয় নির্লজ্জ প্রয়োজনের প্রেম তাহা সে বোঝে, কিন্তু যে রোমাঞ্চময় অপমৃত্যুর ক্ষুধায় সে মজিয়াছে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই, অনেক ভাবিয়া অনীতা এই ভাবেই চলিবে স্থির করিল, জীবনটাকে দেখিবার দুঃসাহস সঞ্চয় করিতে হইবে।

অনেক ইতঃস্তত করিয়া ঈষৎ কাসিয়া যে প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরিয়া

তাহাকে বিব্রত করিতেছিল, অনীতা অভুতভাবে তাহাই বলিয়া ফেলিল—হাসি, রমা ওদের কাছে অনেক কথা শুনেছি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই—

কুমার বাহাদুর কহিলেন—নিশ্চয়ই কি?

অতি কষ্টে অনীতা বলিল—তাদের কথা সত্যি নয়।

ইহার উত্তরে কুমার নিখিলনারায়ণ শুধু হাসিলেন মাত্র।

সেই মুহূর্তে কুমার বাহাদুরের মন হইতে পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া গেল। অনীতার এই ভাব-বিহ্বলতার মধ্যে আসন্ন জয়ের সম্ভাবনায় প্রসন্ন প্রশান্তিতে তাঁহার মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এই কৃত্রিম নাগরিক জীবন এতদিনে কুঞ্জর কাছে বিস্বাদ লাগিল। তাহারা যে ক্রমশঃ অদৃশ্য দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়া পড়িতেছে তাহা এতদিনে বুঝিতে পারিল। অনেকক্ষণ আগে ঘুম ভাঙ্গিলেও সাদা দেয়ালের উদ্ধত বুকের দিকে নীরবে চাহিয়া কুঞ্জ এতদিন পরে সঞ্চয় ও অপচয়ের হিসাব-নিকাশ করিতে লাগিল। অর্থ তাহার সংসারে সচ্ছলতা আনিয়াছে, সমাজে মর্য্যাদা দিয়াছে, ড্রাইভার কুঞ্জকে কুঞ্জবাবু করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কতখানি লাভ হইয়াছে কে বলিবে!

অবশেষে কুঞ্জ অশান্ত চিত্তে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং কাহাকে কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে বাড়ীর পাশের যে পার্কে সে কোনদিন বেড়াইতে যায় নাই সেইখানেই অনেকক্ষণ আনমনে ঘুরিয়া মনটা হাল্কা করিয়া বাড়ি ফিরিল। গ্যারেজের কাছাকাছি গিয়া দেখিল ক্লীনার গাড়িটা ধুইবার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাকে কুঞ্জ বলিল—আজ তোমার ছুটী,—আজ আর গাড়ী সাফ করবার দরকার নেই। বিস্মিত ক্লীনার চলিয়া যাইতেই কুঞ্জ সহস্তে গাড়িখানি ধুইতে আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত গাড়িখানি ধুইয়া সেটিকে সযত্নে পালিশ করিয়া যখন বিশ্রাম করিবার জন্য দাঁড়াইল তখন তাহার মনে হইল শুধু যে গাড়ীখানি পরিচ্ছন্ন

দেখাইতেছে তাহা সব, তাহার নিজের অন্তরের গ্লানি অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে।

প্রফুল্লচিত্তে কুঞ্জ বাড়ির ভিতরে গিয়া নন্দরাণীকে খুঁজিয়া বাহির করিল। জহর ও সুবর্ণ চলিয়া যাইবার পর ড্রয়িংরুম আজকাল বড় আর ব্যবহার হয় না। কুঞ্জর ঘরটা নন্দরাণী নিজেই সাফ করিতেছেন, কুঞ্জকে আসিতে দেখিয়া নন্দরাণী বিশেষ উদ্বেগে ভরে কহিল—এই ভোরে উঠে চা-টা না খেয়ে কোথায় গিছলে বলোত?—কুঞ্জ উত্তর দিবার পূর্বেই জামা কাপড়ে তেলকালীর দাগ লক্ষ্য করিয়া বলিল—এ কি! কাপড় জামায় এ সব কি লাগিয়েছো, কোথায় পড়ে গেছ বুঝি? কি কুক্ষণেই কলকাতায় পা বাড়িয়ে ছিলুম।

নন্দরাণীকে আশ্বস্ত করিয়া কুঞ্জ কহিল—ব্যস্ত হোয়ো না বউ, ব্যস্ত হোয়ো না,—গাড়িখানা আজ নিজের হাতে সাফ করলুম!

—কেন। লোকটা বুঝি আজ আসেনি? তা একদিন না সাফ করলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত, সব তাতেই তোমার বাড়াবাড়ি।

—তুমি যে নিজের হাতে ঘর মুছচো, ঝি, চাকর নেই? কথায় জবাব দাও?

—নন্দরাণী হাসিয়া সোজাসুজি বলিল—সারা জীবন এই ভাবেই কাটিয়ে এলুম, অভ্যাস যাবে কোথায়?

কুঞ্জ অর্থসূচক ভঙ্গীতে কয়েকবার মাথা নাড়িল, তারপর কহিল—তবে?

নন্দরাণী এতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—গাঁয়ের বাড়ী না ছাড়লেই ভালো হ'ত। অন্য কোথাও গেলেও চলতো, কলকাতা আমাদের নয়!

কুঞ্জ কহিল—দরকার যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু শেষবার ছিল। তা ছাড়া কলকাতায় না এলে জহর-সুবর্ণর চলতো না, আমরা

আমাদের কর্তব্য করেছি, কিন্তু বউ অনীর হচ্ছে আমার ভাবনা, খারাপ কিছু হয়েছে বল্‌ছি না তবে ভালোও হোল না। আমি কিছু বলিনি, ভেবেছিলুম এ ভাবে যদি একটা ভালো ঘরে বিয়ে হয়, কিন্তু ভালো ঘর ত' দুরের কথা যাঁরা আসেন কাপড়-চোপড় আর নামটুকু ছাড়া তাঁরা যে কতখানি ভদ্র তা বুঝি না,—আর বিয়ের কথা, কেউ মুখেও আনে না!

গভীর বেদনাভরে নন্দরাণী কহিল—কি কর্‌বো বলো, দোষ আমাদের, আমাকে ও' আর একটুও ভালোবাসেনা বা ভয় করে না, যদি কেউ তোমায় না মানে তাহ'লে আর কি করে কি করা যায়। সে দিন আমার এতখানি কড়া হওয়া হয়ত উচিত হয়নি।

কুঞ্জ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল—তা নয়, তা নয়, অনী তোমাকে ভালবাসে বই কি। আর কিছু নয়, ছেলেমানুষ সব জিনিষ তেমন বোঝে না।

—দিনকতক কোথায় গেলে সত্যি ভালো হয়, অন্ততঃ অনীর এই রাত দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত মোটরে ঘোরাটা বন্ধ হয়।

—বাইরে গেলেও ঐ মোটরে ঘুরে বেড়ানো চল্‌তে পারে, তার চেয়ে দেশে ফিরে চলো।

কুঞ্জ হাসিয়া কহিল—বেশ তাই হবে, এখন একটু চা-টাও দেখি!

নন্দরাণী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল—ছিঃ ছিঃ, তোমাকে এখনো চা দেওয়া হয়নি, অথচ আমি বাজে বকে মরছি,—এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়াই একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া বসিয়া পড়িল।

ভীত শুষ্ক কণ্ঠে কহিল—কি হোল বউ? অমন করছো যে?

অনিচ্ছা সত্বেও অস্ফুটকণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—কিছু না, পায়ে একটু কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে। আর একদিন এমনি হয়েছিল!

কুঞ্জ ও নন্দরাণী যত সহজে দেশে ফিরিবে মনে করিয়াছিল তাহা

আর হইল না। নন্দরাণীর পায়ের ব্যথা এমন তীব্র হইয়া উঠিল যে সে কিছুদিন বিছানা ছাড়িয়া আর উঠিতে পারিল না। অসহ্য শিরা-প্রদাহে নন্দরাণী শয্যাশায়ী হইয়া রহিল। একদিকে নন্দরাণী অপর দিকে অনীতাকে সামলাইতেই বিব্রত কুঞ্জ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

১৭

অনেকদিন জহরের কোনো খবর না পাইয়া সুবর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। চিঠিপত্তর জহর বড় একটা কাহাকেও লেখে না, খেয়ালমত হঠাৎ আসিয়া দেখা করিয়া যায়। অনেক ভাবিয়া সুবর্ণ কাশীপুরের কারখানায় জহরকে দেখিতে গেল। তাহার ব্যবসা যে ভালোই চলিতেছে সে বিষয়ে সুবর্ণর মনে মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কিন্তু তাহা যে এই কয় মাসেই এতবড় একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

এদিক ওদিক ঘুরিয়া অতি কষ্টে 'জেনারেল অফিস' বাহির করা গেল। ভেনেস্তা কাঠের পার্টিসান করা পাশাপাশি অনেকগুলি অফিস ঘর, ঘসা কাঁচের পাল্লায় এ্যাকাউণ্টস্, এন্‌কোয়ারীস্, ম্যানেজিং ডিরেক্টার ইত্যাদি লেখা আছে। চারিদিকে তখনও ভার্ণিসের উৎকট উগ্র গন্ধ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। শুধু মাত্র কয়েকটি টাইপরাইটার ঐক্যতান তুলিয়া অফিসের অখণ্ড গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ণ করিতেছে। সুবর্ণ মনে মনে জহরের সংগঠন-শক্তির প্রশংসা করিতে করিতে বিনা দ্বিধায় ডিরেক্টারের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। জহর একজন সিন্ধী ব্যবসায়ীর সহিত ইলেক্‌ট্রিসিটি ও গ্যাস সম্বন্ধে ব্যবসায়গত আলোচনা করিতেছিল, সুবর্ণকে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। সুবর্ণ কোনো কথা না বলিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া

পড়িল। সিন্ধী ব্যবসায়ীর সহিত কথাবার্তা সংক্ষেপে সারিয়া জহর প্রশ্ন করিল—কি রে স্ববী হঠাৎ যে—ব্যাপার কি? শনিবার দিন Y. W. C. A. গিয়ে শুনলুম্ তুই অন্য কোথায় সিফ্ট করেছিস্, ঠিকানা জানি না কাজেই আর দেখা হোল না। কোথায় উঠেছিস?

স্ববর্ণ সলজ্জ হাসিয়া কহিল, মুলেন ষ্ট্রীট্-এ একটা ফ্লাট্ নিয়েছি,—তারপর আসল কথা চাপিয়া বলিল, এদিকে একটু এসেছিলুম, ভাবলুম তোমার ফ্যাক্টরীটা একবার দেখে যাই, তোমার কারখানাটা ত' খুব বেড়ে উঠেছে দাদা!

—হঁ্যা, তা বাড়্ছে বটে, তবে সব অর্ডার ঠিকমত সামলানো যাচ্ছে না। দিনে চোদ্দ পনের ঘণ্টা খাটতে হচ্ছে—

—এখনও ত' মিস্ত্রীরা কাজ কর্ছে দেখ্লুম, কারখানা আরো বাড়ানো হবে বুঝি?

—না বাড়ালে আর উপায় কি, যা কিছু করতে হবে এই বেলা, আর দু'তিন মাসের ভেতর দেখ্বে অন্ততঃ বারো চোদ্দ বিঘে জমির ওপর ফ্যাক্টরীটা দাঁড়াবে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের জায়গাটাও আমরা পেয়ে গেলুম কিনা।

স্ববর্ণ হাসিয়া বলিল—তোমার সব কাজই বেশ সুশৃঙ্খলায় হয়ে যায় দাদা!

—এর জন্যে কি কম পরিশ্রম করি স্ববর্ণ, একটুও ছুটী নেই আমার।

—ফ্যাক্টরী আরো বড় হয়ে গেলেও কি তুমি এইখানেই থাকবে?

—নিশ্চয়ই! তা নইলে উপায় কি বল? সব জিনিষে নজর রাখতে হয়—

স্ববর্ণ চুপ করিয়া রহিল। যে-মানুষ সমাজ সংসার ছাড়িয়া ফ্যাক্টরীর মোহে এই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পড়িয়া থাকিতে পারে, তাহার অন্তরে

কোথায় কি লুকানো আছে—কে জানে। সহসা জহর প্রশ্ন করিল—মুলেন ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা কেমন রে?

—ভালোই, বেশ নিরিবিলি আর পরিচ্ছন্ন, যা আমি চাই!

—বেশ বেশ, সময় পেলেই একদিন যাবো! ভালো কথা, মা কেমন আছেন বল্‌তে পারিস্। ক'দিন ধরেই যাবে যাবো মনে করছি, কিন্তু একটা না একটা হাঙ্গামে আর হয়ে উঠ্‌ছে না। ঐ ডাক্তারটি না বদ্‌লালে কিছু হবে না। আমার ঐ ডাঃ চক্রবর্ত্তীর ওপর এক বিন্দু বিশ্বাস নেই, এতদিন ধরে রোগটা পুষে রেখে দিয়েছে, ওর চেয়ে ডাঃ এ, এন, মজুমদার—যার কথা বলেছিলাম—চমৎকার ডাক্তার। তা মা বোধ হয় এখন একটু ভালো আছেন আগেকার চেয়ে—না?

—এখন একটু আধটু উঠে হেঁটে বেড়াতে পারেন। আর দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই ওঁরা বোধ হয় ঘাটশীলায় চলে যাবেন।

পরম প্রাজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া জহর বলিল—এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না, অন্ততঃ অনীটা বেঁচে যাবে, কল্‌কাতায় এসে মোটেই পোষালো না। আমাদের কথা আলাদা, ওঁদের কল্‌কাতায় আসাই উচিত হয় নি!

সুবর্ণ শ্লেষ ভরে কহিল—তা হয়নি বটে, কিন্তু দাদা এটাও ভুলো না যে এখানে আনবার মূলে তুমিই প্রধান উদ্যোগী ছিলে, ওঁদের মোটেই আসার ইচ্ছা ছিল না।

ম্যানেজারী ভঙ্গীতে জহর সুবর্ণর মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—তাই নাকি? তা হবে, আমার ও সব মনেই নেই।

ইহার পর কিছুক্ষণ আর কথাবার্ত্তা চলে না। সুবর্ণ কি-ই বা বলিবে। সে শূন্য মনে জহরের পিছন দিকের দেয়ালে লেখা 'Put it shortly—Say it quickly' এই নীতিবাক্যটির দিকে চাহিয়া রহিল। এই কথা কি জহরের মুখেও প্রতিফলিত, এতবড় একটা লোকের সময়ের

অসদ্ব্যবহার করিয়াছে ভাবিয়া সুবর্ণ নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া কহিল—আমি তা'হলে উঠি দাদা, তোমার হয়ত আরো কাজ আছে—

উদার ভাবে জহর বলিল—কাজ ত' আছেই, তা ব'লে কি তোর সঙ্গে কথা কইতেও পাবো না, চল্ তোকে ফ্যাক্টরীটা দেখিয়ে আনি।

সুবর্ণ মোটেই ফ্যাক্টরী দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল না। গ্যাস্, ইলেক্‌ট্রিসিটি, কারখানার কলরব এ সব তাহার একটুও ভালো লাগে না। আগের দিনের মতো জহরের সব কথাতেই সে সায় দিয়া চলিল, কোনো কিছু প্রশ্ন করিল না। এমন একটা মানুষ যে জীবন-যৌবন প্রাণ-মন সমস্ত এই কাজে উৎসর্গ করিয়া বসিয়া আছে, ইহার সার্থকতা কি তাহা সুবর্ণ ভাবিয়া পায় না, সে শুধু কহিল—কি করে ক'মাসের মধ্যে এ সব করেছো বুঝ্‌তে পারি না। তারপর জহরের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—কিন্তু এ তোমার কার ওপর অভিমান দাদা? কিসের জন্য এ কৃচ্ছ্রসাধন কর্‌ছো বুঝি না, এতে কি তোমার এতটুকুও ক্লান্তি নেই? দিনরাত কাজ, কাজ আর কাজ!

জহরের চোখে সেই চির-পরিচিত সুদূরের দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল, অবশেষে সে বলিল—কার ওপর অভিমান কর্‌বো সুবর্ণ? অদৃষ্টের ওপর ত' আর অভিমান চলে না, কষ্ট একটু হয় বৈকি, আমিও ত' মানুষ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আমারও আছে, তবে এর মধ্যে একটা শান্তির সন্ধান পেয়েছি, সেই আমার সান্ত্বনা। অধ্যাত্মশক্তির মত শান্তি আর কিছুতেই নেই।

সুবর্ণ শুধু কহিল—ও!

জহর বলিতে লাগিল—একটা অপূর্ব্ব জিনিষের সন্ধান আমি পেয়েছি, আমার জীবনের সমস্ত রূপ, সমস্ত মতবাদ এক নিমেষেই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে, এ এক অদ্ভুত জিনিষ!

সুবর্ণ ভাবতে লাগিল সোস্যালিজম্, ন্যাশনাল প্ল্যানিং সমস্ত ভাসাইয়া

দিতে পারে এমন কি অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান জহর পাইয়াছে কে জানে! তবে কি সে কোন মঠ বা মিশনের পাল্লায় পড়িয়াছে! গভীর উদ্বেগ ভরে সে প্রশ্ন করিল—পণ্ডিচেরী নাকি দাদা? যোগ সাধনা সুরু করেছ নাকি?

জহর তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—যাঃ, যোগটোগ নয়। আমার এ ব্যবহারিক সাধনা, আমাদের দলের নাম "সম্বুদ্ধ সঙ্ঘ", চীরঞ্জিৎ স্বামীর নাম শুনেছিস্? সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। টেনিস্ খেলায় অদ্বিতীয়, অথচ বড় বড় সাহেব মেমরা পর্য্যন্ত স্বীকার করেছেন যে ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অংশে দেহ ধারণ করেছেন!

সুবর্ণ বলিল—থিওজফীর ভূত শেষকালে তোমার ঘাড়েও চাপ্‌লো?

জহর ঈষৎ বিরক্ত হইয়া সুবর্ণর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি যে বলিস সুবর্ণ, সব বিষয়ে কি ছেলেমানুষী কর্‌তে আছে, প্রয়োজন হলে ইনি যে-কোনো কঠিন রোগ শুধু গায়ে হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে পারেন। এ যে কি তা তুই বুঝ্‌বি না সুবর্ণ!

সুবর্ণ শুধু কহিল—তা হ'বে, তবে তোমাদের দেখ্‌ছি ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের ব্যাপার নিয়ে 'সম্বুদ্ধ সঙ্ঘ' গড়ে উঠেছে, অধ্যাত্ম্য-উন্নতি পরের কথা—

জহর শান্তকণ্ঠে কহিল—শাক দিয়ে মাছ ঢেকে কি লাভ বল, আমরা মন্দিরে যাই ভগবানকে ডাক্‌তে নয়, মনের কামনা তাঁকে জানাতে, যা তোমার মনে রয়েছে বাইরে সেটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করা কি অপরাধ? এই দেখ না ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক্ রোডের জমিটা স্বামীজীর দয়াতেই ত' পেলুম, নইলে ওর কি আশা ছিল কিছু! এতদিন ধরে চেষ্টা করে আমরা হাযরাণ, স্বামীজীকে জানাবার তিন দিন পরে লোকটা উপযাচক হয়ে এসে জমিটা রেজেষ্ট্রী করে গেল।

সুবর্ণ হাসিয়া কহিল—দাদা, তোমার বরাৎ ভালো, আরো কোনো

শিষ্য যদি স্বামীজীর কাছে এই আবদার জানাতেন তাহ'লে যে কি হ'ত জানি না—কিন্তু এই মন্তব্য জহরের মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল দেখিয়া সে কথা ঘুরাইয়া বলিল—ভালোই করেছ দাদা, মনটা তবু ভালো থাকবে, মাকে তোমার কথা বল্‌বোখ'ন আজ আমি চলি!

দরজার কাছে আসিয়া জহর বলিল—হ্যাঁ, মাকে বলিস্ আমি শীগ্‌গীরই একদিন যাবো।

কারখানার বাহিরে অপেক্ষারত ট্যাক্সিতে বসিয়া সুবর্ণ হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। জহর চিরদিন কিছু না কিছু করিয়া আসিয়াছে, আজ সমাজবিচ্যুত হইয়া সে যে অবশেষে আধ্যাত্মিক আশ্রয় অবলম্বন করিবে তাহা আর বিচিত্র কি, তাহার মত মানুষের এই-ই পরিণতি!

জহরের জন্য তাহার অন্তরে যে উদ্বেগ ও আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়াছিল খোলা হওয়ার সংস্পর্শে তাহা কাটিয়া গেল।

ফ্লাট্‌এ ফিরিয়া সুবর্ণ অলককে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে পরম নিশ্চিন্ত মনে মরিস হিণ্ডাসের "We Shall Live Again" বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, পাঠ ইতিমধ্যেই যেরূপ অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে বোঝা গেল সে অনেকক্ষণ আগেই আসিয়াছে।

সুবর্ণ হ্যাণ্ড্‌ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিয়া বিশ্রান্ত ভঙ্গীতে সোফায় বসিয়া কহিল—This is a surprise! আমি ভেবেছিলুম তুমি ঢাকায় না কোথায় যাবে বলেছিলে, হয়ত সেখানেই গেছ!

অলক বইটি চিহ্নিত করিয়া নামাইয়া রাখিয়া কহিল—এই গরমে ছুটোছুটি আর পোষায় না, তা ছাড়া তোমার সঙ্গে দু'একটা দরকারী কথা রয়েছে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া অলক থামিল, সুবর্ণ নূতন কিছু শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, অলক বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, ভালো কথা, মা কেমন আছেন, জানো?

—অনেকটা ভালো, ক্রমেই সেরে উঠ্ছেন!

—তা'হলেই ভালো; আমি সেই ঘাটশীলায় বাড়ি ঠিক করে এসেছি, যাঁকে একবার দেখাতে পারলে লীজ্ নেবার ব্যবস্থা হবে।

—জায়গাটা কেমন, ওঁদের কোনো অসুবিধা হবে না?

—জায়গা ভালোই, একটু আধটু যা অসুবিধা তা থাকতে থাকতেই ঠিক হয়ে যাবে!

—আর অনীতা?

—অনীতার মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে তারও ভালো হবে, এমন নিরাপদ জায়গা আর নেই, তারপর সহসা উঠিয়া অলক স্বর্ণর পাশে গিয়া বসিয়া কহিল—কিন্তু ও কথা থাক্, অনীতা সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্তে আমি আসিনি।

স্বর্ণ বুঝিল অলক আবার প্রেম নিবেদন করিবে, সেই মুহূর্তে জয়ের আনন্দে সে সারা শরীরে বিদ্যুৎ-শিহরণ অনুভব করিল, এক নূতন উদ্দীপনায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুমারীর নমনীয় ব্রীড়া ও মাধুর্য্যে তাহার আনন্দসৌম্য মুখখানি খুসীতে ভরিয়া গেল, কিন্তু একটা অকারণ দুর্ব্বলতা তাহার মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, এইমাত্র জহরের কারখানায় কি দেখিয়া আসিয়াছে, জহর কি বলিল, সেই সব কথাই সে সবিস্তারে অলককে বলিতে লাগিল।

অলক পরম সহিষ্ণুতায় কথাগুলি শুনিতে শুনিতে স্বর্ণর দুটি হাত —সব ক'টি আঙুল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে সেই উত্তপ্ত হাত দুটি মুখের কাছে আনিয়া উষ্ণ চুম্বনে প্লাবিত করিয়া কহিল—সম্বুদ্ধ বা প্রবুদ্ধ সঙ্ঘ জাহান্নামে যাক্, দু' একটা দরকারী কথা আছে।

স্বর্ণ হাসিল, তাহার দৌর্ব্বল্য যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল তেমনি আকস্মিক গতিতে অন্তর্হিত হইল। সে সম্মোহক কণ্ঠস্বরে কহিল—বেশ ত' তোমার দরকারী কথাটাই না হয় শোনা যাক্, সুরু কর।

—সুরু করাই ত' কঠিন, কি করে তোমায় বোঝাই, কি আমি বলতে চাই, তোমার কাছে আমার কথা যে হারিয়ে যায়।

অলকের এই দীনতায় সুবর্ণের মনের সকল কাঠিন্য দূর হইয়া গেল, সে আজ চৈত্রের চাঁদের মতো বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শরীরে একটা অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য নামিয়াছে—রূপ নয় বিভা, অলকের চুম্বনে তাহার অন্তরে আজ আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আজ সে অন্তর-দেবতার কাছে নিজেকে বিনিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিবে। সুবর্ণ ভাবিতে লাগিল কেন অকারণে এতগুলি দিন সে কাটাইযাছে। যেখানে এতখানি মনের মিল রহিয়াছে সেখানে মিলনের আর বাধা কি? মাথার বিস্রস্ত চুলগুলি দু'হাতে গোছাইয়া সুবর্ণ সুনিশ্চিত নিঃসংশয়ে কহিল—তোমাকে নাচিয়ে আনন্দ উপভোগ কর্‌তে আর আমি পার্‌বো না, তুমি কি জানো না, তোমার হাতেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি অনেক কাল আগে, তুমি যে চিরকালের—।

অলক আবেগভরে সুবর্ণকে নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইল, সেই বলিষ্ঠ স্পর্শের আশ্রয়ে সুবর্ণ শান্ত শিশুর মতো তন্দ্রাতুর শিথিলতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিল। জীবনের নিগূঢ়তম রহস্যে নব জনমের সূচনায় অলকের দ্রুত উষ্ণ নিঃশ্বাস তাহার চোখে, মুখে, বুকে বিধাতার প্রসন্ন আশীর্ব্বাদের মতো বর্ষিত হইতে লাগিল।

১৮

এদিকে সেইদিন নন্দরাণীর সংসারে ঝড় উঠিল—

যে-অনীতার প্রগল্‌ভ হাসিতে সারা বাড়ী চঞ্চলতায় বিচ্ছুরিত, বর্ষা-বিস্ফারিত ঝরণাধারার মতো যার দুর্ব্বারতা, হিতাহিতের শাসনে যে-

কোনো দিন ভ্রূক্ষেপ করে নাই, সে সহসা বর্ষণক্লান্ত আকাশের মতো শান্ত হইয়া গিয়াছে। বাড়ির লোকে মনে করিল এ বুঝি ক্লান্ত বিহঙ্গের অবসর গ্রহণের পূর্ব্বাভাষ। নাগরিক কৃত্রিমতায় বুঝি আর তার রুচি নাই। কুঞ্জর মুখে হাসি ফুটিয়াছে, নন্দরাণী রোগ-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়াছে, অনীতার এই রূপান্তর, এতদিনে কুঞ্জ তবু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। দায়িত্বভারমুক্ত কুঞ্জ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু শান্তি কোথায়—? সকালে অনীতা কোথায় যেন গিয়াছিল, তারপর ফিরিয়া সেই যে ঘরে খিল আঁটিয়াছে আর খুলিবার নাম নাই। ইহার মধ্যে যে গুরুত্ব থাকিতে পারে নন্দরাণী প্রথমটা তাহা আশঙ্কা করিতে পারে নাই, কিন্তু বেলা যত দীর্ঘ হইতে লাগিল এই সশঙ্ক স্তব্ধতায় নন্দরাণী ততই আকুল হইয়া উঠিল, অনেক সাধ্য-সাধনার পর অনীতা দরজা খুলিল। কিন্তু একি! এই কয় ঘণ্টার মধ্যে তাহার এ কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! মাথার উন্মুক্ত চুলগুলি ফাঁপিয়া, ফুলিয়া সারা দেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মুখে একটা কঠিন বেদনানুভূতির ছাপ, তাহাকে দেখিলে মনে হইবে সে যেন দীর্ঘকাল কঠিন রোগ ভোগ করিয়া কোনোমতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র।

অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত হইয়া নন্দরাণী ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল—কি হয়েছে মা অনী? অসুখ করেছে? অমন কচ্ছিস্ কেন?

দুঃখের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে অনীতার বেদনাকাতর মুখখানি ভাসিয়া গেল। সে কিছুই বলিতে পারিল না, অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া তেমনই আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল! নন্দরাণীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িয়াই চলিল, কিন্তু কি বেদনায় যে অনীতা এতখানি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। নন্দরাণী নিঃশব্দে অনীতার পাশে গিয়া দাঁড়াইতে অনীতা শিহরিয়া সরিয়া গেল, তারপর বিছানায় বসিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নন্দরাণী তাহার পাশে বসিয়া স্নেহসিঞ্চিত কণ্ঠে বলিল—কি হয়েছে আমায় বল মা, আমি তোর মা, আমাকে ছাড়া আর কাকে জানাবি ?

অনীতা অতিকষ্টে অবশেষে বলিল—সর্ব্বনাশ হয়েছে মা, আর আমি কিছু বল্‌তে পার্‌বো না !

—ছি, পাগ্‌লামী কোরো না, আমরা থাকৃতে তোমার ভয় কি, সর্ব্বনাশ হ'তে দেব কেন ?

অনীতার চোখের জল শুকাইয়া গিযাছে, সে ভীত চকিত দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর মাটির দিকে চোখ নামাইয়া ধীরে ধীরে কহিল—কোনো উপায়-ই নেই—

নন্দরাণী উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতার পাংশু পাণ্ডুর মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল, সহসা এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে পড়িতে নন্দরাণী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিহরিয়া উঠিল, তারপর অস্ফুটকণ্ঠে কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল—তবে কি—?

অনীতা কোনো কথা কহিল না, তেমনই নতভ্রূ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নন্দরাণী তীক্ষ্ণভাবে অনীতার সারাদেহ লক্ষ্য করিয়া অনুভূতিহীন শূন্য মনে বাহিরে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর অনীতার দেহখানি আবার দেখিয়া গভীর হতাশাভরে কহিল—নির্ব্বোধের মতো এ কি কর্‌লি মা ?

কয়েক মিনিট উভয়েই স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, কেহই কোনো কথা কহিতে পারিল না। সহসা নন্দরাণী অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ যা হবার হয়েছে, কিন্তু উপায় একটা আছে বৈকি ! কে এর জন্য দায়ী জান্‌তে চাই, দায়িত্ব তার-ই বেশী।

অনীতা উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর নিষ্প্রাণ কণ্ঠে কহিল—তাতে কোনো ফল হবে না মা, কোনো উপায নেই।

—উপায় নিশ্চয়ই হ'বে, তুমি যদি না ব'লো আমাদেরই লক্ষ সন্ধান নিয়ে জান্‌তে হ'বে। কে সে, যে তার নাম করতে এত আপত্তি ?

—আপত্তি কিছু নেই, লাভও হ'বে না, কুমার বাহাদুর কিছুতেই বিয়ে করবে না। স্পষ্টই বলেছে, প্রমাণ কি ? আদালতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ দিতে যাবো আমি কোন্ মুখে ?

—তোমাকে অসহায় নির্ব্বোধ পেয়ে এতবড় সর্ব্বনাশ করলে আর এখন বিপদের সময় কি না প্রমাণ চাইছে ?

শান্ত কণ্ঠে অনীতা বলিল—কোনো লাভ নেই মা, আজ সকালে শুন্‌লুম কুমার চুপি চুপি দেশে ফিরে গিয়ে সাত-আট দিন হোল সুনীতা মজুমদারকে বিয়ে করেছে !

ঠিক এই সময় কুঞ্জ কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিল, শেষের কথা ক'টি তার কাণে গিয়াছিল, তাই সে রহস্য করিয়া বলিল—মায়ে ঝিয়ে ঘরের ভেতর বসে কার বিয়ে দিচ্ছ গো—? কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া মা ও মেয়ের যা অবস্থা দেখিল তাহাতে ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, কোনমতে ছাতিটা একপাশে রাখিয়া শ্রান্ত কুঞ্জ ব্যাপারটি যে কি হইতে পারে তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া কহিল—কি হয়েছে বউ ? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না !

নন্দরাণী কি বলিবে ভাবিয়া পায় না, এতবড় নিদারুণ দুঃসংবাদ কুঞ্জর মতো স্নেহশীল পিতাকে সে কি করিয়া শোনাইবে, নারী হইয়া নারীর এতবড় অমর্য্যাদার সংবাদ সে কি ভাবে উচ্চারণ করিবে ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

কুঞ্জ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল—তোমরা এমন করলে আমি যে আর মাথার ঠিক রাখতে পারছি না, কি হয়েছে বলোই না ছাই ?

নন্দরাণী এতক্ষণে অস্ফুটকণ্ঠে বলি :—কি যে তোমায় বল্‌বো জানি না, —আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে—।

কুঞ্জ পর্য্যায়ক্রমে সকলকে একবার দেখিয়া লইয়া কহিল—সর্ব্বনাশ ত' আমার সংসারে লেগেই আছে, নতুন কি সর্ব্বনাশ হোল ?

নন্দরাণী বলিল—অনী—। তারপর অনীতার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল। অনীতা কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল, কোন মতে এ ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিলে যেন সে বাঁচিত। নন্দরাণী অতি কষ্টে আবার আরম্ভ করিল—সেই কুমার বাহাদুরের সঙ্গে অনীতা মজুমদার না কার আজ সাত আট দিন বিয়ে হয়ে গেছে অথচ অনী—নন্দরাণী আর কিছু বলিতে পারিল না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া কুঞ্জ অন্য কিছু আশঙ্কা করিয়াছিল, এ সংবাদে সে স্পষ্ট কিছু না বুঝিলেও ইঙ্গিতটুকু বুঝিযা দিশেহারা হইয়া গেল। তাহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া নন্দরাণী উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল, তারপর সান্ত্বনার সুরে কহিল—

—অমন করলে ত' চল্‌বে না, ঠাণ্ডা হযে একটা উপায় করো, মেযেটাকে ত' বাঁচাতে হবে !

কুঞ্জ অভিভূতের মতো নন্দরাণীব মুখের দিকে চাহিযা রহিল, দীর্ঘ অর্থহীন চাহনি। তারপর খুব ধীরে ধীবে বলিল—এই আমাদের কপালে ছিল।

ইহার পর সারা ঘরটিতে একটা অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সহসা অনীতা অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গীতে উঠিযা বসিয়া কহিল—আমার জন্য তোমাদের ভাব্‌তে হবে না, তোমাদের কলঙ্ক যাতে না হয় সে ব্যবস্থা আমি কর্‌বো !

এইবার দীপ্তকণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—দেখ্‌ অনী, নিজের বুদ্ধির দোষে যা হবার তা ত' হয়েছে, এখন ফল ভোগ কর্‌তেই হ'বে, দোষ শুধু তোমার একার নয়। দোষ আমাদের অদৃষ্টের, আমাদের ব্যবস্থার। আমরাই আদর দিয়ে তোমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছি। কিন্তু যা হয়ে গেছে

তা নিয়ে এখন আক্ষেপ করে ত' কোনো লাভ নেই, সাহসে বুক বেঁধে কোনো রকমে সব মানিয়ে নিতে হবে।

কৃষ্ণ সহসা উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল—আমিও কিন্তু ছাড়বো না। যতো বড়ই সে কুমার বাহাদুর হোক, এর একটা বিহিত আমি কর্‌বোই—

নন্দরাণী শান্ত সংযতকণ্ঠে দৃঢ়ভাবে কহিল—অমন উতলা হোয়ো না। মেয়ে নিয়ে আদালতে প্রমাণ দিতে পারবে? ওরা নামেই কুমার বাহাদুর। যদি ধর্ম্ম বলে কিছু থাকতো, শিক্ষাদীক্ষা থাকতো, বংশমর্য্যাদা থাকতো—তাহলে সে কি এত বড় সর্ব্বনাশ করে আবার অম্লান বদনে অন্য মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌তো? এ বাড়িতে এ ধরণের ছেলে এই প্রথম নয়, অদৃষ্টে যা আছে তা সহ্য করতে হবে বৈকি!

অনীতার মৃতকল্প দেহটি সযত্নে ধরিয়া নন্দরাণী যেন বিধাতাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল—আমরা আছি, ভগবান আছেন, ভয় কি মা। তুমি শান্ত হয়ে থাকো, ব্যবস্থা একটা হবেই!

দিনের পর দিন কাটিয়া যায়—

অলক ও সুবর্ণর বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক দিনগুলি মসৃণ গতিতে কাটিতেছে। মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি, অলক ও সুবর্ণ তখনও পুরীতে অলস মন্থরতায় মধুযামিনী যাপন করিতেছে। সমুদ্রের সূর্য্যোদয় দেখিয়া মনে হয় পৃথিবীও যেন এইমাত্র জাগিয়া উঠিল। আকাশব্যাপী অসীম শূন্যতায় যেন একটা অখণ্ড সম্পূর্ণতা!

অলকদের বাড়ী হইতে সমুদ্র অত্যন্ত কাছে, সুবর্ণ বারান্দায় বসিয়া নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতায় বোধ করি সমুদ্রের নীলে সুদূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া ছিল। এমন অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে আচ্ছন্ন হইয়া সুবর্ণ ভাবিতে লাগিল, এই সম্পূর্ণতা যদি মানুষের জীবনে সম্ভব হইত!

আশা ছিল সৌভাগ্যের সূর্য্যোদয়ে নন্দরাণীর সংসারে প্রসন্ন প্রশান্তি

আসিবে, কিন্তু ভাগ্যলক্ষীর সকল করুণা শুধু যেন জহর ও সুবর্ণর জন্যই সংরক্ষিত ছিল। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় জহরের চরিত্রের মানবীয় অংশটুকু নষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায় নাই। তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা ছিল সাফল্য, সে সাফল্য গৌরব সে অর্জ্জন করিয়াছে। সে নিজেও যে সুরুচি ও সৌজন্যের স্নিগ্ধ পরিবেশ কামনা করিয়াছিল তাহাই পাইয়াছে। এমন একটা মানুষের প্রেম ও ভালোবাসার পর আর কি কাম্য থাকিতে পারে! এই মর্য্যাদার বিনিময়ে তাহার কিছুই দিবার নাই—কিন্তু নন্দরাণী ও কুঞ্জ কি পাইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু উচ্ছিষ্ট তাহাই তাহাদের ভাগে পড়িয়াছে। অর্থের অভাব নাই বটে, কিন্তু এই অর্থের বিনিময়ে যদি কিছু শান্তি মিলিত তাহা হইলে জীবন-সায়াহ্নে কুঞ্জ ও নন্দরাণীর তাহাই পাথেয় হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই, তাই তাহাদের আবার কলিকাতা ছাড়িয়া ঘাটশীলার নির্জ্জনতায় অজ্ঞাতবাস করিতে হইতেছে। সুবর্ণ নন্দরাণী ও কুঞ্জর কষ্ট কল্পনা করিতেও পারে না, সৌভাগ্যের মুখ দেখিয়া যদি আবার প্রাক্তণ জীবনে ফিরিয়া যাইতে হয় তদপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে! অনীতা কখনও এক লাইন চিঠি লেখে না, মনে মনে হয়ত তাহাকে শত্রু বলিয়াই ভাবে, নন্দরাণী কুঞ্জও মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়া চিঠি লেখে বটে কিন্তু সে চিঠির প্রচ্ছন্ন সংযত সুর সুবর্ণকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে, কি ভাবে সেখানে দিন কাটিতেছে কে জানে?

অলক অনেকক্ষণ পিছনে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, সুবর্ণর এই উৎকণ্ঠিত ভঙ্গী তাহার চোখে পড়িল। সে ধীরে ধীরে সুবর্ণর কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল—কি ভাব্ছো, ভাল লাগছে না?

অলকের হাতের উপর গভীর আবেগভরে নিজের হাতখানি চাপিয়া সুবর্ণ বলিল—কেন ভালো লাগ্বে না বলো? যা পাওনা—পেয়েছি তার ঢের বেশী, এত বড় আশ্রয় যে আমার মিল্বে, তা কি কখনও ভেবেছি!

শান্তকণ্ঠে অলক বলিল —কি যে বলো, আমি বল্‌ছি যে বাড়ির জন্যে মন কেমন কর্‌ছে না ?

সুবর্ণ মাথা নাড়িল—তারপর অস্ফুটকণ্ঠে কহিল—এত বড় সর্ব্বনাশ যে ঘট্‌বে তা কি কোনোদিন ভেবেছি, এ আঘাত বাবা-মা যে কি করে সাম্‌লাবেন, আমি ভেবেই পাই না। সারা জীবন কাটিযে বুড়ো বয়সে এ কতবড় শাস্তি বলো দেখি !

অলক সুবর্ণর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিযা কহিল—তোমার এই অবিচল নিষ্ঠার আমি প্রশংসা করি। সত্যি কথা বল্‌তে কি প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলুম সেদিনও তোমার এই নিষ্ঠাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, মানুষের জীবনে এইটাই আসল। সত্যি ওঁদের কথা ভাবলে কোনো কূলকিনারা পাওযা যায না, তবে আশা আছে এ বিপদ কোনো রকমে কেটে যাবে।

—তোমার কি মনে হয ?

—বলা শক্ত, অনীতার ব্যাপারে ওঁরা খুবই মুস্‌ড়ে পড়েছেন বুঝি। অনীতার ভবিষ্যৎ যে কি রকম দাঁড়াবে আমি তা কল্পনা কর্‌তে পারি না।

—আহা ! তুমি জানো না, অনীতা আমার বড আদরের ছিল, আমাকে ছেড়ে ওর একটুও চল্‌তো না, যত কিছু আবদার নালিশ সব আমার কাছে। আমাদের মধ্যে ওই ছিল সব চেযে ফুর্ত্তিবাজ, যে ব্যাপার ঘটল ও মোটেই সে জাতের মেযে নয, টাকাটা হাতে না এলে হয়ত এতবড় সর্ব্বনাশ ঘট্‌তো না।

—তা হবে, তবে ওর বুদ্ধিশুদ্ধি কম। ছেলেবেলা থেকেই ও ফিল্মষ্টারদের নকল কর্‌তে গিযেই এই বিপদটা ডেকে আন্‌লে, চরিত্রগত দোষে এ কাণ্ড ঘটেনি, স্মার্ট হতে গিযেই মরেছে। আসলে ও সত্যি ঠাণ্ডা তা আমি জানি। তবে কি জান, এ ও সেই প্রদীপ ও পতঙ্গের

চিরপুরাতন কাহিনী। পতঙ্গের ত' আর সত্যি কোনো অপরাধ নেই, আলো দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, উজ্জ্বল বলেই ছুটে যায়, আগুন বলে নয়।

—যাই হোক্‌, এখন নির্বিঘ্নে প্রসব হ'লে বাঁচি, বিপদ ত' আর একটা নয়।

—দেখ জিনিষটা এমন, ও নিয়ে যতই আলোচনা করবে ততই অশান্তি বাড়্‌বে, কোথায় যে এর শেষ, প্রসবেই এর পরিণতি কি না তা আমি আজো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। চলো সমুদ্রের ধারে একটু বেড়িযে আসা যাক্‌, দিনরাত এ নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই।

সুবর্ণ নীরবে উঠিযা পড়িল।

নন্দরাণীর চিঠিতে যে অনেক কিছুই চাপা থাকিত সুবর্ণর এ অনুমান মিথ্যা নয়। এই কয় মাসে অনীতার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আগ্নেযগিরি নিঃশেষিত হইযা গেলে তাহার সেই শান্ত সমাহিত ভঙ্গীটুকু যেমন যুগপৎ ভয ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে অনীতার এই শান্ত সংযত ভাবটুকু এ সংসারে তেমনই পীড়াদাযক, বরং সে যদি মাঝে মাঝে একটু আধটু বিদ্রোহের চেষ্টা করিত তাহার তবু একটা অর্থ হইত। এ সংসার তাহার কাছে কারাগার হইযা উঠিযাছে, কুঞ্জ ও নন্দরাণী যেন প্রহরী। অনীতা তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দেয, খাবার সাজাইয়া দিলে কোনো মতে খায, কিন্তু তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার কোনো প্রকার ব্যবস্থায়ই কার্য্যকরী হইত না, সে তাহার চারিপাশে নিঃসঙ্গতার পরিমণ্ডল রচনা করিয়া মুহ্যমান হইযা পড়িযা থাকে। কে বলিবে এই মেয়ে রেখায় ও রূপে, সান্নিধ্যে ও স্বপ্নে একদিন কত প্রচুর, কত প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছিল—আজ সে নিজের নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতার তুষানলে

জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। আজ সে বীতবর্ষণ আকাশের মতো নিরাভরণ, রিক্ত।

এখানে একমাত্র আকর্ষণ—সুবর্ণরেখা নদী। অনীতা মাঝে মাঝে নদীর ধারে বেড়াইয়া আসে, কুঞ্জ ও নন্দরাণী প্রথমটা উদ্বিগ্ন হইত এখন সহিয়া গিয়াছে।

সেদিনও বোধ করি অনীতা সুবর্ণরেখার ধারে বেড়াইবার জন্যই বাহির হইয়াছিল, নদীর পথে, তাহাদের বাড়ীর কাছাকাছি একটা পোড়ো জমিতে কয়দিন হইতে একটা মেলা বসিয়াছিল, মেলার আকর্ষণ বিশেষ কিছু না থাকিলেও জুয়ার আকর্ষণে অনেক দর্শক জুটিযাছিল। গোলমাল, রোসনাই, রোসঁন চৌকীর আওযাজে আকৃষ্ট হইয়া অনীতা নিজের অজ্ঞাতসারে সেই মেলার আসরে ঢুকিয়া পড়িল। ভিতরে এক জায়গায় নাগরদোলা ঘুরিতেছিল, মোটর কারের মতো ছোটো ছোটো খাপে সকল বয়সের ছেলে মেয়েরা দোল খাইযা আনন্দ উপভোগ করিতেছে, অনীতা একপাশে দাঁড়াইযা তাহাই দেখিতে লাগিল। দীর্ঘকাল পরে তাহার অন্তর্নিহিত চাপল্য ও উচ্ছাসের যেন নবজন্ম হইল, এই উত্তেজনা—এই চঞ্চলতা তাহার ভালো লাগিল, যে গুরুভার তাহাকে এখনও এই পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল সহসা সে যেন সেই ভারমুক্ত হইয়া গেল। এই জনতা, এই কলরব, এই আনন্দোচ্ছ্বাস তাহার অন্তরে এক অপূর্ব্ব মাদকতা সৃষ্টি করিল। অনেক দিন পরে অনীতা আবার একটু শান্তি পাইয়াছে।

হঠাৎ বালাখেলার ষ্টল হইতে একটা রব উঠিল পুলিশ আসিয়াছে, তারপর কি যে হইয়া গেল—জনতা যে যেদিকে পারিল ছুটিতে লাগিল, —চারিদিকে একটা তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হইল। দু'চারজন লোক অনীতাকে ধাকা দিয়া ফেলিয়া দিল, অনীতা অচৈতন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কালো সোয়েটার পরা যে লোকটি নাগরদোলা

তাকাইতেছিল অনীতাকে সে অনেকক্ষণ হইতে লক্ষ্য করিতেছিল, এই ঘটনার পর সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া চারিদিকের ভিড় সরাইয়া তুমুল হৈ চৈ সুরু করিয়া দিল।

রাত প্রায় ন'টার পর পাঁচ জন লোকে অনীতার অচৈতন্য দেহ বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙিতেই সুবর্ণ টেলিগ্রাম পাইল—"**Baby born, Anita dangerously ill.—Kunja**"

সুবর্ণ ও অলক পরের ট্রেণেই ঘাটশীলায় ছুটিল।

সুবর্ণ ও অলক যখন ঘাটশীলায় পৌঁছিল, অনীতা তখনও বাঁচিয়া আছে কিন্তু ডাক্তারবাবু বলিলেন—**It is only a matter of minutes.**

অনীতার বিছানার পাশে নন্দরাণী ও কুঞ্জ পাথরের মতো স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সুবর্ণ ও অলকের দিকে তাহারা একবার চাহিল মাত্র, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। অনীতার শিথিল তন্দ্রাতুর দেহখানি বিছানার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে

উদ্‌গত অশ্রুরাশি চাপিতে না পারিয়া সুবর্ণ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। যে-বর্ণচ্ছটাময় বিলাসিতাকে অনীতা স্বর্গের মতো রমণীয় মনে করিয়া নিঃসংশয়ে বরণ করিয়া লইয়াছিল, আজ অভিশপ্ত দেবশিশুর মত সেই স্বর্গ হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইবে। এই অলক্ষ্য মৃত্যুর ক্রম-সন্নিহিততায় সুবর্ণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

অলক পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, টেবিলের উপর একখানি খোলা টেলিগ্রাম পড়িয়াছিল, অলক সেটি সুবর্ণর হাতে তুলিয়া দিল, কলিকাতা হইতে জহর টেলিগ্রাম করিয়াছে—"**Deepest sympathy, will come later if possible.—Jahar**"

সুবর্ণ টেলিগ্রামটি টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

অলক সুবর্ণর বিহ্বল ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল—কি আর করবে বল, এই একমাত্র পথ, সবদিক দিয়েই অনীতা আমাদের মুক্ত করে গেল। বিধাতার আশীর্ব্বাদ যে ছেলেই হয়েছে, আর একটি মেয়ে হয় নি!

কিছুক্ষণ পরে নন্দরাণী অনীতার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সুবর্ণ তাড়াতাড়ি নন্দরাণীকে ধরিয়া বসাইল. নন্দরাণীর কথা কহিবার শক্তি নাই, কাঁদিবারও সামর্থ্য নাই। কুঞ্জ উদ্‌ভ্রান্তের মতো সারা ঘরটিতে পায়চারি করিতে লাগিল। তাহাদের এই চরম দুর্দ্দশায় সুবর্ণ ও অলক যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে তাহাদের শান্ত করা বোধ করি স্বয়ং বিধাতারও সাধ্যাতীত।

কুঞ্জ বারবার বলিতে লাগিল—মেয়েটাকে বাঁচাতে পার্‌লুম না বাবা, বাঁচবার ওর খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কি যে হলো! গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো একই সুরে ঐ একই কথা সে বহুবার বলিয়া গেল।

অলক সহসা পাশের ঘরে গিয়া নার্সকে কহিল—দেখুন আপনি এক কাজ করুন, ছেলেটাকে মার কোলে ফেলে দিয়ে আসুন, নইলে কিছুতেই ও' আর সাম্‌লাতে পার্‌ছি না।

নার্স মাথা নাড়িয়া এ প্রস্তাব সমর্থন করিল, তারপর অনীতার সেই সদ্যোজাত সন্তানটীকে আনিয়া নন্দরাণীর কোলে শোয়াইয়া দিল।

নন্দরাণী গভীর অনুরাগে শিশুটিকে বুকে টানিয়া লইল। কুঞ্জ ধীরে ধীরে উঠিয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

একদিন এমনই কয়েকটি শিশুকে লইয়া নন্দরাণী নীড় রচনা করিয়াছিল। মাটির ধরণীতে স্বর্গ রচনা করিবার কল্পনা সেদিন তাহার ছিল কি না কে জানে, আজ আর একটি অবাঞ্ছিত শিশুকে লইয়া তাহাকে আবার নূতন করিয়া নীড় বাঁধিতে হইবে।

সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি।

মূর্তিমতী বিরতির মতো নিস্পন্দ নিষ্কম্পতায় নন্দরাণীর দিকে চাহিয়া স্বর্ণ তেমনই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।
